পরিবেশ । পরিকাঠামো । পর্যটন । জঙ্গল
জনসত্ত্বা । শিক্ষা । স্বাস্থ্য । সাহিত্য । সংস্কৃতি
অগাস্ট ২০১৫ । মূল্য ১২ টাকা

এখন ডুয়ার্স

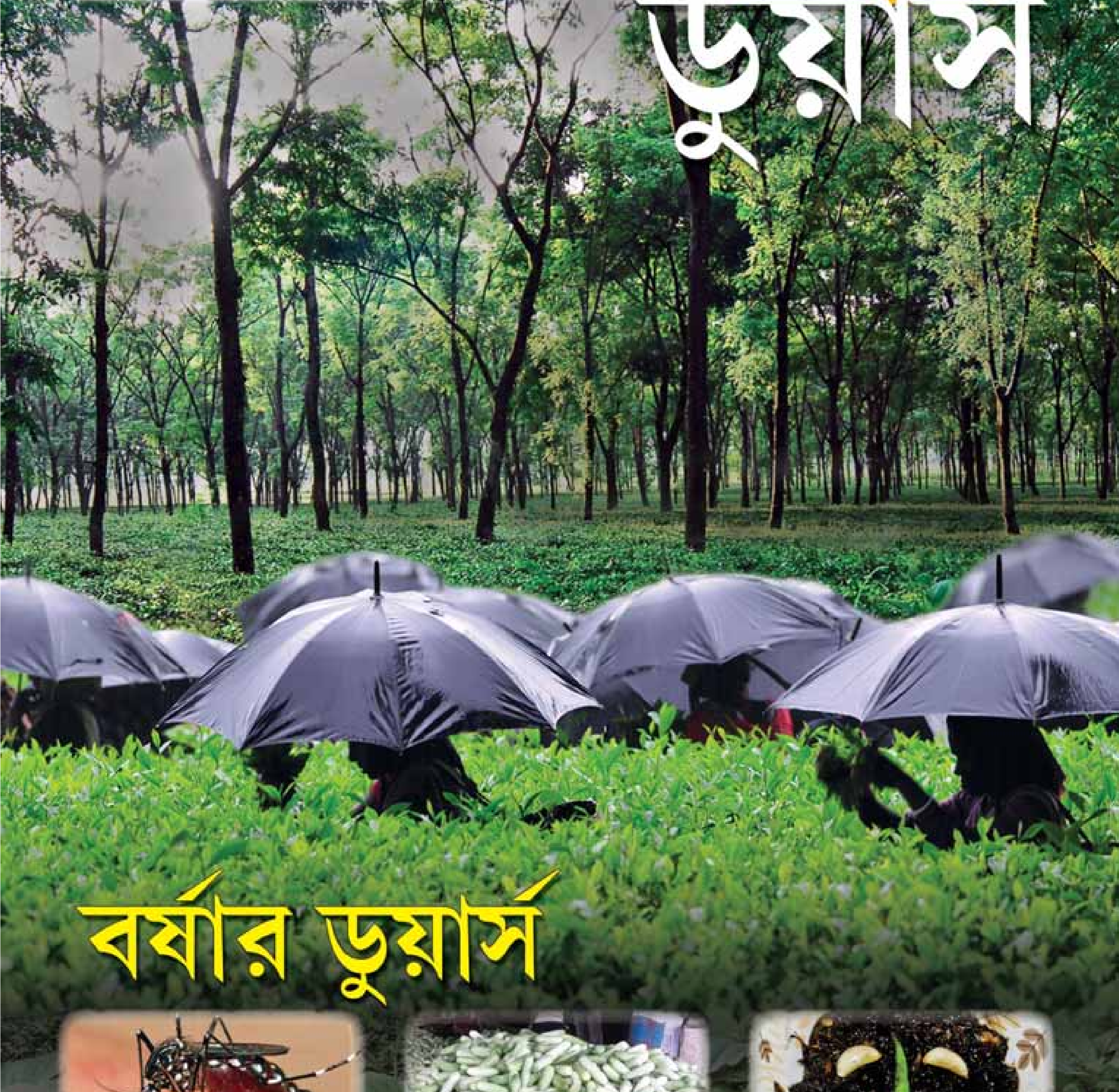

বর্ষার ডুয়ার্স

মারণরোগ রুখতে এবার কতটা প্রস্তুত ?

ভাঙনে ও প্লাবনে কেমন আছেন চাষিরা ?

ডুয়ার্সের ডিশ স্বর্গীয় সিদল

ডুয়ার্সের জরুরি কিছু ফোন নম্বর

বিমান পরিষেবা
এয়ার ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৫১১৪৯৫/১৪০৭
জেট এয়ারওয়েজ, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৫৩৮০০১
স্পাইস জেট, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৬৯৮০৮৫
গো এয়ার, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৬৯৮০২২
ডুক এয়ারওয়েজ, শিলিগুড়ি। ফোন
৯৬৭৯৯৯৯৯৬৯

হেলিকপ্টার সারভিস ফর সিকিম
ফোন ০৩৫৩-২৫১০৮৭২

বাস পরিষেবা
এন বি এস টি সি, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৫১২৯৭৩
তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-২৫১৪৯২০, ২৫১২৯৭৩
সিকিম ইন্টারনেশনাল ট্রান্সপোর্ট। ফোন
০৩৫৩-২৫১২০৮২

রেল পরিষেবা
এনজেপি রেলওয়ে এনকোয়ারি শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-২৬৯১৮০০, ২৬৯০৮০৮/১৩১
শিলিগুড়ি জংশন, শিলিগুড়ি। ফোন
০৩৫৩-২৫১০০১৭
আলিপুরদুয়ার জংশন ০৩৫৬৪-২৫৫০৯১
নিউ আলিপুরদুয়ার, ০৩৫৬৪-২৫৫২০৭
নিউ কোচবিহার, ০৩৫৮২-২২৩৩৪
নিউ মাল, ০৩৫৬২-৫৫০৯৭
জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২০৪৯
নিউ ময়নাগুড়ি, ০৩৫৬১-৩৩০৪৮
ফালাকাটা, ০৩৫৬৩-৬০২৩১

অ্যাম্বুলেন্স
কোচবিহার
সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স, কোচবিহার মেন রোড
ফোন ০৩৫৮২-২২২৭৪২
সারদা অ্যাম্বুলেন্স, মাথাভাঙা, কোচবিহার
ফোন ৯৬৪১৯০৯২৭৯

জলপাইগুড়ি
মিউনিসিপাল অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস
ফোন ০৩৫৬১-২৩১০৯৬

শিলিগুড়ি
অ্যাম্বুলেন্স হসপিটাল, শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-২৪৩৬৫২৬
ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি
ফোন ০৩৫৩-২৪৩৫২৩৪

নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, শিলিগুড়ি
০৩৫৩-২৫৭৫৭৪৮
শিলিগুড়ি নার্সিহোম, শিলিগুড়ি
ফোন ৯৮৩২৩৬৭৫৯১
রেড ক্রস। ফোন ২২৫৬৩৫২
বিট্টা। ফোন ২২৫৬০৭৯
আলিপুরদুয়ার ০৩৫৬৪-২৫৫৯৩৮

ব্লাড ব্যাঙ্ক
কোচবিহার
এম জে এন হসপিটাল, ব্লাড ব্যাঙ্ক
ফোন ০৩৫৮২-২৩১০৪৯

জলপাইগুড়ি
জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাঙ্ক হাসপাতাল পাড়া,
জলপাইগুড়ি ফোন ০৩৫৬১- ২২০০৪৭

আলিপুরদুয়ার
এস ডি হসপিটাল, ০৩৫৬১-২৭৪০৮৫

শিলিগুড়ি
নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, ফোন
০৩৫৩-২৫৫৮৪৭৮
রোটারি ব্লাড ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি,
০৩৫৩-২৫১৩২৪০
শিলিগুড়ি সদর হসপিটাল, শিলিগুড়ি,
০৩৫৩-২৪৩৫৭৩৬

গভর্মেন্ট পেট কেয়ার
ভেটিনারি হসপিটাল ইন শিলিগুড়ি, ফোন
৯৪৩৪২৫৬৪৯৯
ভেটিনারি হসপিটাল ইন কোচবিহার, ফোন
০৩৫৮২- ২২৭৭৫১
ভেটিনারি হসপিটাল ইন জলপাইগুড়ি,
০৩৫৬১-২৩০৬৬৭

প্রশাসনিক দপ্তর
কমিশনার, শিলিগুড়ি, ০৩৫৩-২৫৭১৯৪২
ডেপুটি কমিশনার, শিলিগুড়ি,
০৩৫৩-২৪৩২৭৯২
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি,
০৩৫৩-২৪৩৩৫৮৮
ডি এম, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২৩০১২৭
এ ডি এম, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২৩০৭০১
এস পি, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২৩০৪৯২
এস ডি ও (সদর), ৭৭৯৭৮৬০৪০০
এস ডি ও (মালবাজার), ৭৪০৭৪৯৪১০০
ডি এম, আলিপুরদুয়ার ০৩৫৬৪-২৫৫০৬২/
২৫৭৪১
এ ডি এম, আলিপুরদুয়ার,০৩৫৬৪-২৫৫০৬২
ডি এম, কোচবিহার, ০৩৫৮২-২২৭১০১
এ ডি এম, কোচবিহার,
০৩৫৮২-২২৭১০২/৩/৪

এস ডি ও, সদর, ৯৪৩৪১০১৭৭০
এস ডি ও, তুফানগঞ্জ, ৯৪৩৪১০১৭৫০
এস ডি ও, দিনহাটা, ৯৭৩৩০০০৬৬১
এস ডি ও, মাথাভাঙা, ৯৪৩৪৭০৩৬২২
এস ডি ও, মেখলিগঞ্জ, ৯৫৪৭২১৭৫৭২

ফায়ার সার্ভিস
আলিপুরদুয়ার, ০৩৫৬৪-২৫৭৫০৩
ধূপগুড়ি, ০৩৫৬৩-২৫০০০১
হাসিমারা, ০৩৫৬৬-২৪০১০১
জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২৩০১২৯, ১০১
মালবাজার, ০৩৫৬২-২৫৫০৮০
কোচবিহার-ফায়ার ব্রিজ, ২২৯১০১

পুলিশ স্টেশন
শিলিগুড়ি, ০৩৫৩-২৬৬২১০১/২৪২০১০১
এন জে পি, ০৩৫৩-২৫৬১০৮৮
প্রধান নগর, ০৩৫৩-২৫১০০৪৬
মাটিগাড়া, ০৩৫৩-২৫৭১৪৭২
বাগডোগরা, ০৩৫৩-২৫৫১২৪২
ভক্তিনগর, ০৩৫৩-২৫৪৩৬৬৫
ময়নাগুড়ি, ০৩৫৬১-২৩৩০৩২
ধূপগুড়ি, ০৩৫৬৩-২৫০০৪০
ফালাকাটা, ০৩৫৬৩-২৬০২৪২
বীরপাড়া, ২০৩৫৬৩ ২৬৬০৫৩
ক্রান্তি, ০৩৫৬২-২৬৫২৯৪
আলিপুরদুয়ার, ০৩৫৬৪-২৫৫১০০
বানারহাট, ০৩৫৬৫-২৫২০৬৩
বারোভিসা, ০৩৫৬৪-২৫৩৩৪৪
কুমারগ্রাম, ০৩৫৬৪-২৫২২২৪
মাদারিহাট, ০৩৫৬৩-২৬২২২৩
হাসিমারা, ০৩৫৬৬-২৫৫০২৮
জয়গাঁও, ০৩৫৬৬-২৬৩২০০
কালচিনি, ০৩৫৬৬-২৪০১০০
কামাক্ষাগুড়ি, ০৩৫৬৪-২৫২২২৪
মালবাজার, ০৩৫৬২-২৫৫০০২
মেটেলি, ০৩৫৬৫২৪২২০১
নাগরাকাটা, ০৩৫৬১-২৭২০০২
রাজগঞ্জ, ০৩৫৬১-২৫৪২৩১
শামুকতলা, ০৩৫৬৪-২৪০৩০০
কোচবিহার, ০৩৫৮২-২২৮১০০
দিনহাটা, ০৩৫৮১-২৫৫০০৪
মাথাভাঙা, ০৩৫৮৩-২৫৫২৩৩
তুফানগঞ্জ, ০৩৫৮২-২৪৪২৩০
মেখলিগঞ্জ, ০৩৫৮৪-২৫৫২২৪

বিদুৎ পরিষেবা
ডিভিশিনাল ম্যানেজার, ইলেকট্রিসিটি,
০৩৫৩-২৫৪২৮৬৩
জোনাল ম্যানেজার, শিলিগুড়ি, ২৫৪০৪৩২

এই তালিকা বলাই বাহুল্য অসম্পূর্ণ এবং এটিকে মোটামুটি সম্পূর্ণ করবার কাজ চলছে। এব্যাপারে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করি, ভুল সংশোধন ও নতুন সংযোজন দুইয়ের ক্ষেত্রেই। এরকম একটি সম্পূর্ণ তালিকা ডুয়ার্সে সম্ভবত আগে কখনও হয়নি। আশা করি পাঠক এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবেন এবং সক্রিয় সহযোগিতা করবেন— সম্পাদক

এখন ডুয়ার্স

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অগাস্ট ২০১৫

ডাকে ডুয়ার্স

মোহিনী ডুয়ার্স আসলে দুঃখিনী ৪

ছন্দে ছবিতে ডুয়ার্স ৪

পাঠকের ডুয়ার্স

মহীরুহ নিধনের ক্ষতিপূরণ কি সম্ভব? ৬

এখন ডুয়ার্স

মারণরোগ রুখতে কতটা প্রস্তুত ডুয়ার্স ৯

ভাঙনে আর প্লাবনে ডুয়ার্সের চাষিরা কেমন আছেন ১১

ফালাকাটা আজও স্রেফ একটি বাসস্টপ! ১৩

ময়নাগুড়ির আরেক নাম এখন সমস্যাগুড়ি ১৪

ডুয়ার্সে প্রথম ক্রীড়া গ্রন্থাগার ১৫

ভানুনগরে ভানুভক্ত স্মরণ ১৫

চলে গেলেন কবিতা ও কথাসাহিত্যের দুই শিল্পী ১৬

স্বাস্থ্য বিমা যোজনা সাধারণের অর্থ নয়ছয়ের এক গভীর উৎস ১৭

আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট 'ঝুপড়ি' ঘরে ১৮

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

সোনালি চা-বাগানের শ্রমিক সমবায় হতে পারত এক নতুন সংগ্রামের দিশারী ১৯

সীমান্তে ডুয়ার্স

ছিটমহলের ছেঁড়া কথা ২৬

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই ৩০

বিস্মরণে ডুয়ার্স

অবলুপ্তির পথে মাঝি জনজাতি ৩৪

ডুয়ার্সের মুখ

ওরা পঞ্চপাণ্ডব ৩৫

পর্যটকের ডুয়ার্স

বানেশ্বরের মোহনদের ছবি এখন ফেসবুকে ৩৬

গল্প

শিকার ৩৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

বসন্তপথ ৪০

তিস্তা ৪৫

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স

চল্লিশে পা দিল জলপাইগুড়ির কলাকুশলী ৫০

ডুয়ার্সের ডিশ

সিদল অথবা স্বর্গীয় শুটকি ৫২

খেলাধূলার ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের ইতিহাসের সাক্ষী ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব চায় সরকারি সহযোগিতা ৫৪

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে

কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী

অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী

সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, গৌতমকান্তি গুন, দিলীপ বড়ুয়া

বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা

প্রকাশনা দপ্তর, কলকাতা এই অবকাশে, ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ৭০০ ০২৯

ডুয়ার্স দপ্তর দোতারা, সম্প্রীতি সরণি, ধূপগুড়ি ৭৩৫২১০ (জেলা-জলপাইগুড়ি)

বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ ছবি শান্তনু সরকার

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয় বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এখন ডুয়ার্স-এ যোগ দিন

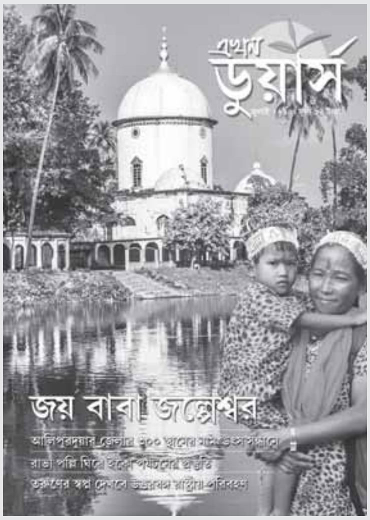

আপনিও যখন প্রতিবেদক

আপনিও হতে পারেন এখন ডুয়ার্সের প্রতিবেদক। কীভাবে? আপনার এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা চিত্র প্রদর্শনী অথবা প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো তো লেগেই আছে। লক্ষ্য রাখুন কবে কোথায় কী ঘটছে। সেই সব অনুষ্ঠান ও খেলার আঁখো দেখা হাল ছবি সমেত পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। রিপোর্ট ২৫০ শব্দের মধ্যেই হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছবি পাঠান সিডি বা ডিভিডিতে। রিপোর্ট টাইপ করা হলে ছবি সহ মেলও করতে পারেন।

ম্যাগাজিন স্টলে এখন ডুয়ার্স

প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি ০৩৫৩-২৫৩১০১৭, শিবমন্দির ৯৮৩২০২৯৫১৪, জলপাইগুড়ি ৯৭৩৩২৪৬৯১৩, হলদিবাড়ি ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩, মালবাজার ০৩৫৬-২২৫৫০১৫, ওদলাবাড়ি ৮৩৪৮৪৫০০০৭, চালসা ৯৭৭৫৪১৫১৪৪, বিন্নাগুড়ি ৯৪৩৪৮০৯৫৯০, বীরপাড়া ৯৫৯৩৩৫৪১৫২, লাটাগুড়ি ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫, ময়নাগুড়ি ৯৯৩৩১৯০৮৫৮, ধূপগুড়ি ৯৬৪৭৭৮০৭৯২, ফালাকাটা ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫, আলিপুরদুয়ার ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭, কোচবিহার ৯৪৩৪২১৭০৮৪, তুফানগঞ্জ ৯৮০০৮৫২৬৬৭, মাথাভাঙা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, দিনহাটা ৯৮৩২৩৪৭৪৫১, মালদা ৯৯৩২৯৬৭৯৯১, রায়গঞ্জ ৯৪৩৪৪২৩৫২২।

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক ০৩৩-২২৫২৭৮১৬

মোহিনী ডুয়ার্স আসলে দুঃখিনী

সেই আদিকাল থেকে শুনে আসছি বর্ষা আসা মানেই ডুয়ার্সে দুঃখের সীমা নেই। বছরভর যে নদীগুলি শীর্ণকায় বেঁচে থাকে, বর্ষা এলেই তারা সব করাল রূপ ধারণ করে কোনও এক অজানা আক্রোশে যেন ভাসিয়ে দিতে চায় দু'পাশের জনপদ। ভেসে যায় বাড়িঘর, গরু, ছাগল, পুকুরের মাছ, জমির ফসল। দরিদ্র অসহায় মানুষগুলিকে শাস্তি দিয়ে যেন এক বিকৃত আনন্দ পায় প্রকৃতিদেবী। তারপর তো আছেই মশাবাহিত আর জলবাহিত যত সব মারণরোগ। পোলট্রির মুরগির মতই একের পর এক টপাটপ মরতে থাকে মানুষ। স্বাধীনতার বয়স প্রায় সত্তর হতে চলল, উন্নয়নের হাইওয়ে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে আমাদের দেশ, অথচ এই প্রাপ্তির ভূখণ্ডটির বর্ষায় দুর্দশার বর্ণনা আজও সেই একইরকম শোনায়। তেমনই কোনও পরিবর্তন নেই ডুয়ার্সের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আচরণে। এখানকার বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখনও লোকসভা-রাজ্যসভা- বিধানসভায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলঘরে গিয়ে লাজুক লাজুক মুখে চুপটি করে বসে থাকেন। ভাবখানা এমন— 'নিজের গাঁয়ের দুর্দশার কথা কেউ পাঁচ কান করে নাকি আবার!' তবে হ্যাঁ, হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কখনও অরুচি নেই— মাইনেপত্র তো ঠিকমতো পেতে হবে, বলুন!

অথচ জঙ্গি কার্যকলাপের মুক্তাঞ্চল বলে বারবার প্রমাণিত সীমান্তবর্তী এই এলাকায় মানুষের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে অবিরাম অনুপ্রবেশের চাপে, চা-বাগানের অভুক্ত শ্রমিকের চোখের জল মিশে গেছে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায়। সে নিদারুণ দুঃখের কথা শোনার বা বলার মতো সময় কি আমাদের কারও আছে? আমরা বরং আমাদের ডুয়ার্সকে দু'পাতার রঙিন পুস্তিকায় ভরে নিয়ে কোনও পর্যটন মেলার দোকান খুলে বসি গে! নতুবা হাতির কিংবা রঙবেরঙের প্রজাপতি আর পাখির ছবিতে ফেসবুক ভরাই!

ডুয়ার্সের অরণ্যে যেমন কয়েকশো প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি মেলে তেমনই তিস্তা থেকে সংকোশ কবি কিংবা ফোটোগ্রাফারের অভাব নেই। তবু ডুয়ার্সের কান্নার আওয়াজ আমরা বাইরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি আজ অবধি। বর্ষা পেরোলেই আসে শরৎ-শীত-বসন্ত। পরিযায়ী পাখির মতই দলে দলে বেড়াতে

ছন্দে ছবিতে ডুয়ার্স

ঝম্‌ঝমানি বৃষ্টি হলেই ধুক্‌পুকানি প্রাণ
স্মৃতির ওপার থেকে ভাসে আটষট্টির বান
ভাঙল নদী, তিস্তা নদী, সব কিছু খান্ খান্
জল-কাদাতে লাশ ডুবিয়ে শহর করে স্নান।

মৃত্যুমিছিল সেদিন ছিল, আবার হবে না তো?
নদী এখন নদী তো নেই, বুক জুড়ে তার ক্ষত।
চর পড়েছে, নাব্য নদী প্রত্যহ হয় হত
জল নিয়ে হয় চাপান-উতোর, রাজনীতি হয় কত।

নদীর বুকে কষ্ট জমে, মৃত্যু-পরোয়ানা
নদীর গতি আটকে দিতে মানুষই দেয় হানা
সেই ভুলেরই পাহাড় জমে, কে শোনে কার মানা?
নদী এখন ভুলতে বসে নিজস্ব ঠিকানা।

বিশাল নদী, ছোট্ট নদী, নদীর ছেলেমেয়ে—
স্বপ্ন ছিল উত্তরের সেই জমিজিরেত বেয়ে
প্রাণের সুধা ছড়িয়ে দেবে আসবে সবুজ ছেয়ে
নদীয়ালি মাছের টানে নাও ভাসাবে নেয়ে।

আজ নদী কি পর হয়েছে? সেই নদী আর নদী?
নদীর পাশে দাঁড়াও এটা বুঝতে পারো যদি।

ছন্দে অমিত কুমার দে। ছবিতে বাবু শীল

ডুয়ার্সের অরণ্যে যেমন কয়েকশো প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি মেলে তেমনই তিস্তা থেকে সংকোশ কবি কিংবা ফোটোগ্রাফারের অভাব নেই। তবু ডুয়ার্সের কান্নার আওয়াজ আমরা বাইরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি আজ অবধি।

আসে বাইরের পর্যটকের দল। বর্ষার ডুয়ার্সের এই করুণ রূপ কখনওই তাদের সামনে আমরা তুলে ধরার কথা ভাবি নি। অথচ বন্যা বা সংক্রমণ নিয়ে মিডিয়ার দায়িত্বহীন প্রচারে অনেক সময়ই পর্যটক সমাগমে ঘাটতি দেখা যায়।

গোটা বিশ্ব জুড়েই প্রকৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্বশীলতাকেই পর্যটনের নতুন সংজ্ঞা হিসেবে মানুষরে কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার প্রচার শুরু হয়েছে এবং এ রাজ্যেও সম্প্রতি তৈরি হয়েছে ইকোটুরিজম বোর্ড। এছাড়া স্বঘোষিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরও ঘাটতি নেই। কিন্তু প্রশ্ন ছিল কোনও প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রের স্থানীয় মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সমব্যথী না হতে পারলে পর্যটকদের মনে দায়িত্ববোধটা আসবে কী করে? ডুয়ার্সের এমপি-এমএলএ'রা আগের মতই আগামী দিনেও নিজেদের কর্তব্য আইনসভায় হাজিরা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন এ নিয়ে যেমন সংশয় নেই অতএব তাদের দিকে তাকিয়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু পুজোর কিংবা বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে আসা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষগুলিকে যদি আমরা ডুয়ার্সের বন্যপ্রাণের

পাশাপাশি এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের ছবিও দেখাতে পারতাম তাহলে হয়ত দায়িত্বশীল পর্যটন প্রসারে অনেকটা এগিয়ে যেতাম। ডুয়ার্সের 'সৃজনশীল' মানুষেরা নিজেদের মতো করে এই দায়িত্বটুকু পালন করতে শুরু করুক না।

ছবি: প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

মহীরুহ নিধনের ক্ষতিপূরণ কি সম্ভব ?

পঞ্চাশ বছরের পুরনো একটি গাছ কেটে ফেলা মানে আজকের বাজারে দশ কোটি টাকার লোকসান

বারান্দায় বসেই সময় কাটে। সামনে ছোট মাঠ, শিশুরাই খেলাধূলা করে। মাঠের পরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত জাতীয় সড়ক, বিরামহীন যানবাহন অসংখ্য মানুষের যাতায়াত কত রকমের গাড়ির মিছিল। রাস্তার ওপারে অর্থাৎ পূর্বদিকে মায়াদির বাড়িটা ফাঁকা। চাকরি থেকে অবসর নেবার পূর্বে থাকতেন ওই বাড়িতে, সেবা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে হৃদ্যতা প্রকৃতই ছিল অন্তরছোঁয়া। বাড়িটার উপর দিয়ে ৪/৫টা সুপারী গাছ মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা। দেখা যায় একফালি আকাশ। ওই ফাঁক দিয়েই প্রতিদিন বেশ গাঢ় লাল রঙের বড় সূর্য আত্মপ্রকাশ করে। আকাশের বেশ কিছুটা অংশে লালচে আভার আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। কড়া হয় রোদের তেজ। জাতীয় সড়কের দু'পাশের শতাব্দী প্রাচীন মূল্যবান বৃক্ষ সমূহ মসলিনের মত হালকা ছায়া আচ্ছাদন করে রাখে। বারান্দায় বসেই এই বিচিত্র সহাবস্থানের সাক্ষী প্রকৃতির পরিবর্তন মনটাকেও এক তৃপ্তি প্রদান করে। সব মিলে ভালই লাগে।

চা-বিস্কুট দিয়ে যায় ললিতা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুটো শালিক উড়ে এসে বসে গেটের উপর। কয়েক টুকরো ভাঙ্গা বিস্কুট ওদের সামনে ছড়িয়ে দিই। লক্ষ করলাম অপেক্ষাকৃত কৃশ পাখিটা বিস্কুটের টুকরোগুলি না খেয়ে মুখের মধ্যেই ধরে রাখছে। পরমুহূর্তেই কারণটা বুঝতে পারলাম। মুখভর্তি বিস্কুটের টুকরো নিয়ে সাঁ করে উড়ে গেল বাড়ির সোজাসুজি জাতীয় সড়কের পাশে বড় গাছটার মগডালে। পাতার ফাঁকে পাখিটাকে ঠিক বোঝা না গেলেও একথা ঠিক ওই পাখিটা ওখানে ডালের ফাঁকে পাতার মাঝে খড়কুটো দিয়ে একটা বাসা তৈরি করেছে এবং সে বাসাতেই অপেক্ষা করছে ঠোঁট সর্বস্ব হাঁ করে থাকা ২/৩টে পক্ষী শাবক। নিমেষে মা পাখি বিস্কুটের টুকরোগুলো খাইয়ে নেমে এল গেটের উপর। কেমন মায়া হল আবারও দিলাম বিস্কুট ছাড়িয়ে। অনুভব করলাম মাতৃ হৃদয়ের অন্তরের গভীর অনুভূতি।

গত ২০ মে ২০১৫ সকালেই একটা জিপ এসে মাঠে দাঁড়াল। অনুমান করলাম কোনও সরকারি কর্তাব্যক্তি হবেন, হয়ত বা যানবাহন পরিদর্শকের দল। কিন্তু আমার অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণ করে মাঠে ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকখানা রিকভারি ভ্যান তার সঙ্গে আরও কিছু গাড়ি ও লোকজন। গাড়ি থেকে কিছু কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতিও নামাল। তখনও ব্যাপারটা আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। ৩/৪ জন আলাদা হয়ে একটা বড় গাছের গোড়ায় হাজির হল, একজনের হাতে বেশ বড় একখানা দা। বড় গাছটির গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চতার মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকটা খাঁজ কেটে দিল। তারপরের কর্মতৎপরতা একাধারে রোমহর্ষক এবং বুদ্ধি, কায়িক শ্রম ও সাহসিকতার সহবস্থানে অসাধারণ তারিফযোগ্য। এক হাতে দাঁ এবং কাঁধে লম্বা রশির একগাছি কাঁধে রেখেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বিশাল মোটা বৃক্ষটিকে। খাঁজ কাটা জায়গায় পা রেখে এবং উপরের দিকে খাঁজ কাটতে কাটতে পা রেখে উঠে গেল গাছের মগডালে। দ্বিপ্রাহরিক সূর্যের অবস্থান বুঝতে ঘাড়ের যে ভঙ্গিমার প্রয়োজন ঠিক সে রকম অবস্থাতেই লোকটিকে ঠাহর করা সম্ভব। এর মধ্যে লাল পতাকা হাতে দু'জন রাস্তার দুই প্রান্তে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর। উপরে ওঠা লোকটি নিমেষে গাছের মোটা, পাতলা ডালগুলি কেটে নিচে সশব্দে ফেলছে। নিচের লোকজন মুহূর্তে ডালপালা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। যাতে যানজট না হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পথের দু'ধারের বিশাল বিশাল মহীরূহ কেমন আব্রুবিহীন, কঙ্কালসার চেহারায় রূপান্তরিত হল। গাছের এই পরিণতি দেখতে দেখতে কেমন একটা মানসিক অবসাদ সমস্ত শরীর মন গ্রাস করে নিল। গাছের ডালের সশব্দ পড়ার শব্দ বুঝতে পারছি কিন্তু কোনও উপলব্ধি নেই। দুপুরের মধ্যেই বড় গাছের উপরের মোটা পাতলা ডাল সশব্দে যেমন নিচে পড়েছে তৎপরতার সঙ্গে সে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরেও গেল। এখন দাঁড়িয়ে আছে আব্রুবিহীন কঙ্কাল গাছের সারি। অপেক্ষা কতক্ষণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে?

নারকীয় উৎসব, উল্লাস রীতিমতো সরগরম করে রেখেছে অঞ্চলটাকে। তৎপর ব্যক্তিরা ন্যাড়া গাছগুলির নিচে স্থাপন করল যন্ত্রচালিত করাত। চালু করে দিল এক নাগাড়ে, বৃক্ষগুলির অন্তিম আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে বেশ দূর থেকে। আর্তনাদ এক সময় বন্ধ হল, নারকীয় উল্লাসের মধ্যে ভূলুণ্ঠিত হল মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বৃক্ষ। কয়েকটা পাখি লোকজনের জটলা উপেক্ষা করেও ওই গাছটির পাশে এদিক ও ওদিক উড়ে গেল। পাখির ডাকে হতাশার সুর সম্ভবত তার সাধের খড়কুটো ঘরের অস্তিত্ব আর নেই। বিগত শতবর্ষ জুড়ে যে বৃক্ষ তিলে তিলে নিজে বেড়ে উঠেছে, প্রাকৃতিক নিয়মে মানব সভ্যতার প্রয়োজনে পরিবেশ সুস্থ সবল রেখেছে, আজ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হলে হারিয়ে গেল চিরতরে। মুক্ত হল দায়বদ্ধতা থেকে। আমাদের পরিভাষায় যে সব বৃক্ষ মূল্যবান বলে অভিহিত করি সে সব গাছেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। তার মধ্যে ছিল অর্জুন, জারুল, রেন ট্রি, দেবদারু, মেহগনী প্রভৃতি।

দেবদারু পাতা দিয়ে অনুষ্ঠান সাজাবার রীতি প্রচলিত ছিল বেশ কয়েকবছর পূর্বে। গয়েরকাটা বাণিজ্যিক এলাকার কয়েকটি ছেলে হয়তো কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে গেট সাজাবার অভিপ্রায়ে এক বোঝা দেবদারু গাছের পাতা সংগ্রহ করেছে। সেই মুহূর্তে বাগানের ম্যানেজার কুশল সিং বিষ্ট, হিমাচল প্রদেশের মানুষটি সশরীরে হাজির। গাছের ডাল ভাঙা নিয়ে ওই ছেলেদের কাঁদিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে এনে বলেছিলেন গাছকাটা খুনজনিত অপরাধ, গাছ পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করে তা কি এরা জানে না? এই ঘটনা ১৯৮৫ সালের, মুহূর্তেই সেই বৃক্ষদরদী মানুষটার কথা মনের গভীর থেকে বলে উঠল সর্বনাশের ঘণ্টা নিজেরাই বাজিয়ে চলেছে এখন শুধু দৃশ্যটাই দেখে নেওয়া। বিকেল হতেই যতগুলি আকাশছোঁয়া বৃক্ষ ছিল সবগুলিই ভূলুণ্ঠিত। সেদিন শেষ যে গাছটি ধরাশায়ী হয়েছিল তার বেড় ১৫/২০ ফুটের বেশি ছাড়া কম হবে না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভকামনা, মঙ্গলভাবনা নিয়ে যে ছায়া সুনিবিড় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে তার নিধন যজ্ঞ সমাপন এত সহজ তা কি ভাবা যায়? যে মহীরূহ রূপ নিতে শতাধিক বৎসর অতিক্রম করেছে তাকে সমূলে সরিয়ে দিতে সামান্য কয়েক ঘণ্টা। আধুনিক সভ্যতার অবদান। সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে গয়েরকাটার এক নিবিড় নৈকট্য জড়িত এবং বলা যায়

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভকামনা, মঙ্গলভাবনা নিয়ে যে ছায়া সুনিবিড় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে তার নিধন যজ্ঞ সমাপন এত সহজ তা কি ভাবা যায়? যে মহীরূহ রূপ নিতে শতাধিক বৎসর অতিক্রম করেছে তাকে সমূলে সরিয়ে দিতে সামান্য কয়েক ঘণ্টা। আধুনিক সভ্যতার অবদান।

আত্মিক যোগ। তাঁর স্মৃতিঘেরা বাড়িটাতে বর্তমানে কর্মসূত্রে বসবাস করেন জয়দীপ ও বুবু। বুবু ফোন করেছিলেন সমরেশবাবুকে—'সমরেশদা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না রাস্তার দু'পাশের সেই বিশাল বিশাল গাছগুলি এখন আর নেই। উঃ কী কষ্ট হচ্ছে দেখতে।' সমরেশবাবু ফোন কেটে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর 'ঘরে ফেরা' রচনায় লিখেছিলেন—'ফোন রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। বিশাল গাছগুলোতে বিকেল হতে না হতেই অন্ধকার জমে যেত। পরপর দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ডালে তখন হাজারো পাখির রাত্রিবাসের আয়োজন, আরও একটু মিহি অন্ধকার নামলেই মদেশিয়া তিন-চারটে ছেলে গুলতি নিয়ে গাছগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে বাদুড়ের সন্ধান করত। ওই গাছগুলো যেন একটা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হিসেবে এতকাল একত্রিত ছিল। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে গাছগুলোকে সরে যেতে হয়েছে।' সভ্যতার প্রয়োজনে প্রকৃতিকে বলি তো দিতেই হবে। তুফানগঞ্জ অঞ্চলের প্রকৃতিপ্রেমী কিছু যুবক বিশাল গাছগুলি থাকাকালীন ভিডিও ফোটোগ্রাফি করে রেখেছেন। আগামী দিনে ভিডিও দেখেই গাছপালার পেলব অবস্থান অনুভব করবেন। সামগ্রিকভাবে যে চরম সর্বনাশ ঘটে গেল তা পুনরুত্থান কি আর কোনওদিন করা যাবে? উদ্ভিদ, লতাপাতা, বৃক্ষ, গুল্ম, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি সব মিলেই পরিবেশ। মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করছে পরিবেশ। সুতরাং পরিবেশ রক্ষাকারী উপাদান, যাতে কোনওভাবে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সচেতন বা সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য।

পরিবেশ উদ্ভিদ জগৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নাই। গবেষক বিজ্ঞানী তারকনাথ দাশ গাছের উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গবেষণা করে যে মূল্যায়ন করেছেন তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সি একটি বৃক্ষের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

১) অক্সিজেন উৎপাদন	২,৫০,০০০ টাকা
২) বাতাস দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণ	৫,০০,০০০ টাকা
৩) ভূমিক্ষয় এবং উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ	২,৫০,০০০ টাকা
৪) জলে বিবর্তন এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	৩,০০,০০০ টাকা
৫) পশুপক্ষীর আশ্রয় স্থান	২,৫০,০০০ টাকা
৬) প্রোটিন রূপান্তর	২০,০০০ টাকা
মোট	১৫,৭০,০০০ টাকা

আজকের দিনে এই অঙ্কের পরিমাণ কত দাঁড়ায় নিজেরাই হিসেব করুন।

জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশের রাসায়নিক চক্র নিরন্তর সক্রিয় থেকে আপন আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে সর্বদা তৎপর। 'ইকোলজি নানা শাখা-প্রশাখার সমাবেশ। একটা বিরাট ও জটিল বিদ্যা। আবার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সমগ্র জীবজগৎ এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনায় আজকের দুনিয়াকে অনেকটা সময় দিতে হচ্ছে এবং আরও দিতে হবে। পরিবেশ বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব বিদ্যার ওতোপ্রোতো সম্বন্ধ। বিষয়টি জটিল কিন্তু এর আবরণ উন্মোচন করতে করতে চমক লাগে, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।' (সংহতি, ১৯৯৭, জগন্নাথ বিশ্বাস)

এক কথায় মানুষের সমাজ ব্যবস্থা জীবন ধারণ সব কিছুই উদ্ভিদ গাছপালার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অন্যের পরিপূরক। বর্দ্ধিত জনসংখ্যা, শহরায়ণ বিভিন্ন অগ্রগতির ফলে বন জঙ্গল ক্রমে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে ফলস্বরূপ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে নানাভাবে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা,

কৃষি ফলনের তারতম্যের কারণে নানাভাবে সমাজজীবন বিঘ্নপ্রাপ্ত হচ্ছে। সমাজের সরল জীবন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। দেশের অগ্রগতি ঘটছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেন উত্তরোত্তর প্রয়োজন বাড়ছে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সামগ্রিক জীবনচক্রের গতি স্তব্ধ করে—কখনওই সমর্থন যোগ্য নয়। লক্ষ লক্ষ বিশাল বিশাল মূল্যবান বৃক্ষ সমূহ উৎখাত করা হল। এমন নয় কেউ এ ব্যাপারে জানতে পারেনি। প্রয়োজনে রাস্তা সম্প্রসারণ হবে তা রোধ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি পরিকল্পনার রূপরেখা রাতারাতি বাস্তব রূপ পায়নি। সুতরাং অভাব দূরদর্শিতার এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার।

শাসক গোষ্ঠী বহুপূর্ব থেকেই এই ক্ষতি সাধনের কথা অনিবার্যভাবে জেনেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু কেন বিকল্প ব্যবস্থার কথা তারা ভাবলেন না? কে দেবে এর উত্তর? একথা ঠিক প্রারম্ভিক পর্বে রাস্তা সম্প্রসারণের অংশ বাদ দিয়ে যদি বৃক্ষ রোপণ করা হত তাহলে শতবর্ষ প্রাচীন সেই ছবি ফিরে আসত না। তবে উদ্যম অভিনন্দিত হত এবং একটা ঐক্য প্রচেষ্টার ভাব লক্ষ করা যেত। আমাদের দেশে কোনও অন্যায় বা অপরাধ করলে কোনও সাজা তো হয়ই না, কৈফিয়ত পর্যন্ত দিতে হয় না। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ অবলীলায় নারকীয় উল্লাসে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ক্রিমিনাল অফেন্স। বিচারক কোথায়? সুধী সমাজের কোনও ভূমিকা এখন পর্যন্ত সংবাদপত্র বা মিডিয়াতে কোনও গুঞ্জন শোনা যায়নি। যারা গবেষণাধর্মী কর্মতৎপরতায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটিয়ে দেওয়া হল? গত ৩ জুন ২০১৫-এ চাঁচল কলেজের অধ্যাপক শ্রীশান্তনু বসু উত্তরবঙ্গ সংবাদে লিখেছিলেন—'বিগত ছয় যুগে শাসকরা কেবল গাছই কেটেছে।' কেটেছে শব্দটি বিশ্লেষণ করলে একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়—কেটেছে অর্থাৎ ধ্বংস করেছে। আমরা যদি যথার্থই একটু গভীরভাবে ভেবে দেখি অনায়াসে উপলব্ধি করব যে কোনও ক্ষেত্রেই এই বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

এখান থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার রাস্তার একটা সমীক্ষা নেবার চেষ্টা করেছিলাম। মাত্র দুই কিলোমিটার ব্যবধানে একচল্লিশটি বিশাল বিশাল গাছ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এবার সামান্য গড় হিসেব করে অপূরণীয় ক্ষতির পরিমাপ করা সম্ভব। আবারও বলতে হয় সুধী সমাজ, প্রকৃতিপ্রেমিক, গবেষকবৃন্দ, শাসকগোষ্ঠী তাঁরা কোনওভাবেও কি এর বিকল্প কিছু ভাবতে পারলেন না? না কি ভাবনার কথাই গুরুত্ব পায়নি কিংবা প্রয়োজন বোধ করেননি। কে দেবে এর উত্তর?

ব্রজগোপাল ঘোষ
গয়েরকাটা চা-বাগান

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

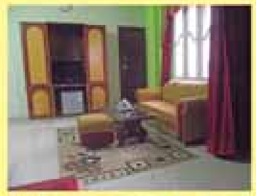

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC,
Non AC , Conference Hall

HOTEL **Green View**

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (0), 9434756733 (M)

Centrally located between
Gorumara NP & Chapramari WLS

East Batabari Chalsa
Dist. Jalpaiguri
Phone:
94343 76466
98325 01328

DOOARS
PALM RESORT
LODGING | FOODING | PACKAGE TOUR
dooarspalmresort@gmail.com

Package Tour
Hotel Booking
Car Rental

Specialist in Sikkim, Darjeeling, Dooars, Bhutan

Wild Leaf

Wild Leaf Holidays

Contact Bumba - 94343 19850, 97330 12921, 03562 260329
mail : info.wildleaf@gmail.com

Opposite Gas Godown, Chalsa, Jalpaiguri

মারণরোগ রুখতে কতটা প্রস্তুত ডুয়ার্স

বর্ষার ঘনঘটা শুরু হতেই আবার সেই মারণরোগের ভ্রূকুটি ডুয়ার্স জুড়ে। গতবার যার হত্যালীলায় রীতিমতো পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল সমগ্র ডুয়ার্স। যার কুফল পড়েছিল পুজোর মরশুমে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসাতেও। এবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া যায় না মোটেই। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আশেপাশের মানুষকে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সচেতন করে তুলতে হবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাঠককেই। তাই পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ডা. শান্তনু মাইতি।

প্র: ডাক্তার বাবু, নমস্কার। ভেতরে আসব?

❑ হ্যাঁ এসো। বোসো। তোমার মেয়েটি ভালো আছে তো? বয়স কত হল এক বছর পেরিয়েছে না? ওর তো বয়স অনুযায়ী সব টিকা নেওয়া আছে। এবার জাপানি এনসেফালাইটিস-এর ভ্যাকসিন নিতে হবে তো।

প্র: হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। সেটা নিয়ে জানতেই তো এলাম। জানি এই সময়টা আপনার চেম্বার একটু ফাঁকা থাকে। তাই এ সময় এলাম। মিনিট দশ-পনেরো সময় আমাদের দিতে হবে কিন্তু। জাপানি এনসেফালাইটিস রোগটি সম্পর্কে সবকিছু জেনে নেব আপনার কাছ থেকে। আমি তো স্কুলে বায়োলজির টিচার, ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে পারব। আর দেখুন সঙ্গে দু'জনকে এনেছি। এ আমার বোন, ও শালগুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ.এম.এস। ও সঙ্গে এনেছে ওদের আশা দিদিকে।

❑ বা। খুব ভাল টিম হয়েছে দেখছি। এই মারণ রোগ সম্পর্কে সবারই ভাল করে জানা দরকার। তোমরা স্কুলে আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনেক মানুষকে জানাতে পারবে। সবাই জানলে রোগটাকে ঠেকানো সহজ হবে।

প্র: প্রথমে বলুন, এনসেফালাইটিস রোগটা আসলে কী?

❑ এনসেফালাইটিস শব্দটির অর্থ হল ইনফ্লামেশন অফ ব্রেন। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'মস্তিষ্কের সংক্রমণ ও প্রদাহ'। অনেক সময় মস্তিষ্কের বাইরের আস্তরণ অর্থাৎ মেনিনজেন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন তাকে বলা হয় মেনিনগোএনসেফালাইটিস।

প্র: এনসেফালাইটিস-এর কারণ কী?

❑ বেশিভাগই ভাইরাস ঘটিত। যেমন হারপিস, রেবিজ, পোলিও, মিডলেস ভাইরাস। এগুলোর সংক্রমণকে বলা হয় স্পোরাডিক অর্থাৎ মাঝে মধ্যে হয়। জাপানি এনসেফালাইটিস রোগটি কিন্তু এনডেমিক, যেখান থেকে এপিডেমিকেও পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ প্রতি বছরই অল্পবিস্তর সংক্রমণ থেকে হঠাৎ মহামারি আকার ধারণ করতে পারে। এই ভাইরাসটি এক ধরনের ফ্ল্যাভি ভাইরাস। আরও কয়েকটি রোগ এই ভাইরাস দিয়ে ঘটে যেমন ওয়েস্ট নাইল ফিভার, সেন্ট লুই ফিভার। ওগুলো অবশ্য আমাদের দেশে হয় না। আফ্রিকায় দেখা যায়।

প্র: জাপানি নামটি কেন?

❑ প্রায় একশো বছর আগে জাপানে এই রোগের কারণ আবিষ্কৃত হয়। তারপরে চিন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড আর পরে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় ২৪টি দেশে এটি এনডেমিক রূপে আছে।

প্র: রোগটি কি খুবই ভয়ঙ্কর?

❑ নিশ্চয়ই। বর্তমানে এটিই সবচেয়ে ভয়ানক, কারণ এর মারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। যদিও সংক্রমণ হার কম, যেমন দেখা

গেছে ২৫০ জনের সংক্রমণ ঘটলে মাত্র একজনের রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু মৃত্যুর হার খুবই বেশি। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ।

প্র: ডাক্তারবাবু, এবার বলুন রোগটি কীভাবে ছড়ায়?

❑ মশার কামড় থেকে রোগটি ছড়ায়। যেমন ম্যালেরিয়া ছড়ায় অ্যানোফিলিস মশা আর ডেঙ্গু ছড়ায় এডিস মশা, তেমনই

মানুষ থেকে মানুষে এই রোগ ছড়ায় না। মানুষের সংক্রমণকে আমরা বলি ডেড এন্ড অর্থাৎ হয় মানুষটি মারা যাবে নয় বেঁচে থাকবে। কিন্তু মানুষের রক্তে ওই ভাইরাসটির লালন পালন হবে না। তাই মশা কামড়ালে মশার পেটে জীবাণু প্রবেশ করবে না।

জাপানি এনসেফালাইটিস ছড়ায় কিউলেক্স মশা। তার মধ্যে কিউলেক্স ট্রাইটেনিওরিনকাস প্রজাতিটি প্রধান ভূমিকা নেয়।

প্র: তবে কি মানুষ থেকে অন্য মানুষে রোগ ছড়ায়? অর্থাৎ রোগাক্রান্ত কোনও ব্যক্তিকে কামড়ে একটি মশা যদি অন্য সুস্থ মানুষকে কামড়ায় তার কি এনসেফালাইটিস হয়ে যাবে?

❑ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। মানুষ থেকে মানুষে এই রোগ ছড়ায় না। মানুষের সংক্রমণকে আমরা বলি ডেড এন্ড অর্থাৎ হয় মানুষটি মারা যাবে নয় বেঁচে থাকবে। কিন্তু মানুষের রক্তে ওই ভাইরাসটির লালন পালন হবে না। তাই মশা কামড়ালে মশার পেটে জীবাণু প্রবেশ করবে না। মশার দেহে ভাইরাসটি প্রবেশ করে শুয়োর ও জলজ পাখির দেহ থেকে এরা অ্যামপ্লিফায়ার-এর কাজ করে। এরা এনসেফালাইটিস হয়ে মরে না, কিন্তু রোগ ছড়ায়।

প্র: তবে কি শুয়োর যেখানে চাষ করা হয় বা ঘুরে বেড়ায় তার আশপাশে রোগটি বেশি হবে? সেক্ষেত্রে শুয়োর মেরে ফেললে কি রোগ ঠেকানো যাবে? আর বছরের এই সময়টায় অর্থাৎ বর্ষাকালে কেন রোগটি বেশি হয়?

❑ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, রোগটি দেখা গেছে শহরের একটু বাইরে যেখানে শুয়োরের চাষ সেখানে বেশি হয়। কিন্তু শুয়োর মেরে ফেলে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ শুয়োর ছাড়াও জলজ পাখিরা যেমন নানা ধরনের বক, সারস ইত্যাদি এমনকি পরিযায়ী পাখি যেমন বুনোহাঁস এরাও রোগটির রিজার্ভার। এদের তো ধ্বংস করা সম্ভব নয়। সেই কারণে রোগটি পুরোপুরি নির্মূল করা মুশকিল। বর্ষাকালে রোগটি বেড়ে যায়, তার কারণ বর্ষার শুরুতে জলাজমিতে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে। এরাই জীবাণু সংক্রমণের বাহক।

প্র: কী কী লক্ষ্মণ দেখে বোঝা যাবে যে এনসেফালাইটিস হয়েছে?

❑ এই রোগের ইনকিউবেশন পিরিয়ড ৫ থেকে ৭ দিন। অর্থাৎ মশার কামড়ের পাঁচ-সাত দিন পরে রোগ লক্ষ্মণ দেখা যায়। প্রথমে জ্বর, গা হাত পা ব্যথা, মাথা ব্যথা থেকে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে। অসুখটি তীব্র আকার ধারণ করলে খিঁচুনি হয়। তীব্র জ্বরের সঙ্গে রোগী ভুল বকতে পারে। জ্ঞান হারিয়ে কোমায় চলে যেতে পারে। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডাক্তারি পরিভাষায় আমরা বলি, 'এ ই এস' বা 'অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম'।

প্র: চিকিৎসা করে রোগটা সারানো যায় না?

❑ যেহেতু এটি ভাইরাসঘটিত রোগ তাই ওষুধ প্রয়োগ করে সারানো মুশকিল। কার্যকরী অ্যান্টিভাইরাস থেরাপি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। চিকিৎসা মোটামুটি সাপোর্টিভ অর্থাৎ রোগ লক্ষ্মণ বুঝে তার চিকিৎসা। অসুস্থ অবস্থায় সঠিক যত্ন অর্থাৎ নার্সিংও গুরুত্বপূর্ণ।

প্র: রোগ সেরে যাওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তির অন্য কোনও উপসর্গ বা জটিলতা দেখা যেতে পারে?

❑ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রোগটি খুবই মারাত্মক। কারণ এর মারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। আবার যারা বেঁচে ওঠে তারাও পুরোপুরি সুস্থ হয় না। ভাইরাসটি যেহেতু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কে আঘাত করে তাই নানা ধরনের স্নায়ু সংক্রান্ত জটিলতা দেখা যায়। হাতে পায়ের দুর্বলতা থেকে শুরু করে পঙ্গুত্ব পর্যন্ত হতে পারে। অনেক রোগী শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি হারায়। প্রায় চল্লিশ শতাংশ রোগীর এ ধরনের জটিলতা দেখা গিয়েছে।

প্র: ডাক্তারবাবু এখন বলুন এই মারাত্মক রোগটাকে কীভাবে ঠেকানো যাবে?

❑ আমি তো প্রথমেই বলব, মশা থেকে সাবধান। ঘরের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল জমতে না দেওয়া, রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো এসব ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। মশা ঠেকাতে পারলে মশাবাহিত অন্য রোগ দু'টি অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুও ঠেকানো যাবে। আর আছে ভ্যাকসিন। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে এখন জ্বর রোগীর জন্য ফিভার ক্লিনিক খোলা হয়েছে, জ্বর হলে অবশ্যই যেতে হবে।

প্র: ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

❑ জাপানি এনসেফালাইটিসের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ভ্যাকসিন বর্তমানে আমাদের দেশেই তৈরি হচ্ছে। সরকার থেকে বিনামূল্যে এক থেকে ১৫ বছর বয়সি সব শিশুদের এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের যে অংশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে এই টিকা আগে চালু করা হয়েছে।

প্র: বাচ্চাদের কেন দেওয়া হচ্ছে? বড়রাও কি টিকা নিতে পারে?

❑ রোগটির সংক্রমণ ও মৃত্যুহার শিশুদের মধ্যে বেশি বলে এই ব্যবস্থা। বড়রাও টিকা নিতে পারে। ২৮ দিন অন্তর দুটো টিকা নিলে প্রায় ১০০ শতাংশ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত বাজার থেকে কিনে টিকা নেওয়া যেতে পারে।

ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। অনেকটা সময় দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে বললেন। আমরাও অনেক কিছু জানলাম। আমাদের নিজেদের এলাকায় এবং কাজের জায়গায় গিয়ে আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করব সবাইকে জানাতে, যাতে এই মারাত্মক রোগটিকে দূরে রাখা যায়।

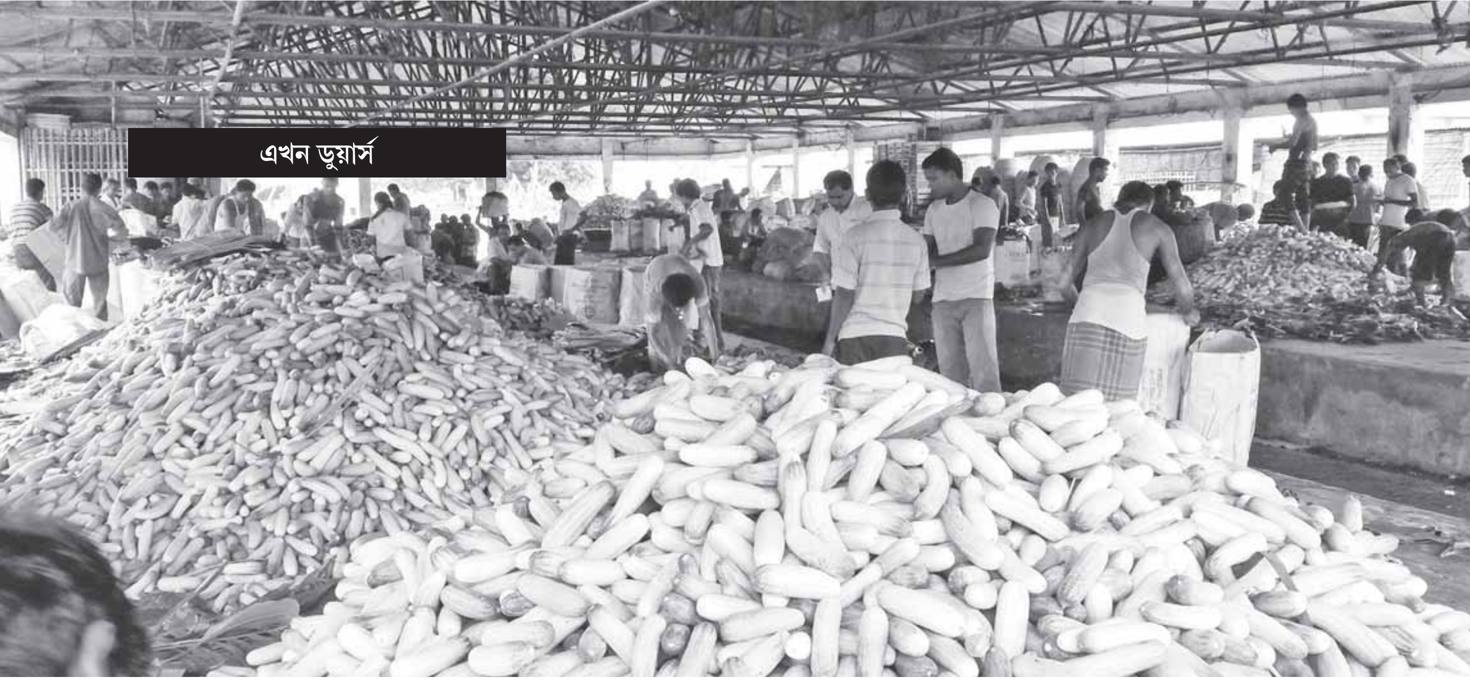

ভাঙনে আর প্লাবনে ডুয়ার্সের চাষিরা কেমন আছেন

অসংখ্য ছোট-বড় নদীর সমাবেশ ডুয়ার্সে। বর্ষায় উত্তরের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল তীব্রবেগে ছুটে আসে সমতলের জনপদে। বছরের অন্য সময় নিতান্তই শান্ত নিরীহ নদীগুলি। কিন্তু বর্ষার মাস তিনেক মাঝে মধ্যেই ক্ষেপে ওঠে। বন্যায় ভাসে আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, সঙ্কোশ, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, ডায়না, ডুডুয়া বন্যা সৃষ্টিতে কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। তিস্তা ব্যারেজের জল ছাড়লে তো কথাই নেই। গ্রামের পর গ্রাম নদীতে পরিণত হয়। বঙ্গের অন্য অঞ্চলের তুলনায় নিম্ন হিমালয়ের এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অনেক বেশি। প্রকৃতির সঙ্গে তাই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলে ডুয়ার্সের চাষির।

শীতকালের মনোরম আবহাওয়ায় নিশ্চিন্তে চাষ করা যায়। আর বর্ষার চাষ তুলনায় অনেক ঝুঁকির। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বেড়েছে। তাই দশ বছর আগের মতো এখনকার চাষি কিন্তু চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষ করে না। প্রযুক্তির সাহায্যে স্বল্প সময়ে উচ্চফলনশীল ফসলের চাষে এখন সবাই ঝুঁকেছে। চাষের কাজে গরুর ব্যবহার এখন প্রায় হয় না বললেই চলে। বছর পাঁচেক আগে পাওয়ার টিলার ব্যবহার হত, এখন তাও অতীত; জায়গা দখল করেছে দেশি-বিদেশি ট্রাক্টর। যদিও এর মালিকানা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাষির নেই। ফেলো কড়ি, করো চাষ। বিঘা পিছু এক থেকে দেড় হাজার মতো খরচ। শস্য বৈচিত্র্য আগের থেকে অনেক বেড়েছে। দুই ফসলি জমি এখন ক্ষেত্র বিশেষে তিন ফসলি এমনকি চার ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। প্রথাগত ধান আর পাট চাষের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এখন বিভিন্ন লাভজনক সবজি চাষে মন দিয়েছেন ডুয়ার্সের চাষিরা। মন দেবেন নাই বা কেন? দশ বছর আগে পাটের দাম ছিল মণ প্রতি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। এখনও বাজার প্রায় সেই একইরকম আছে, হাজার বারোশ'র মতো। পাট চাষের অমানবিক পরিশ্রমের কথা আর নাই বা তুললাম।

আর ধান? সেও তো কম যায় না। ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে এখন ধান বিক্রি হচ্ছে হাজার টাকা কুইন্টাল। এক বিঘা জমিতে কম-বেশি ছয় কুইন্টাল আমন অর্থাৎ বর্ষার ধান হয়। তার মানে ছয় হাজার টাকা। খড় পাওয়া যায় হাজার টাকার মত। খরচ হয় প্রায় বিঘায় পাঁচ হাজার টাকার মত। তিন-চার মাসে চাষির আয় মাত্র দু'হাজার টাকা। এই মাগ্গিগন্ডার বাজারে কৃষক তাহলে বাঁচবে কীভাবে? সারা বছর চাল কিনতে হবে না, একমাত্র এই আশায় লোকসান হলেও চাষিরা বাধ্য হন ধান চাষ করতে। আর যাদের নিচুজমি অর্থাৎ যেখানে বর্ষায় জল জমে থাকে সেখানে ধান চাষ করা ছাড়া উপায়ও থাকে না। অতিবৃষ্টি আর বন্যা যা কিনা এই তিন মাস ডুয়ার্সের নিত্য সঙ্গী, তাতে মার খাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই উত্তরের চাষিরাও নিজেদের চিন্তা-ভাবনা বদলে ফেলেছে। একটু খরচ সাপেক্ষ, কিছুটা চ্যালেঞ্জ আছে নতুনত্বে। কিন্তু তাতে কি? শর্ত একটাই আপনার উঁচু জমি থাকা চাই। জল যাতে না দাঁড়ায়। বৃষ্টি হোক না, যত খুশি। বর্ষায় এখন দেদার চাষ হচ্ছে সবজির। কী নেই তাতে? বেগুন, শসা, ঝিঙে, পটল, করলা, লাউ, বরবটি, পেঁপে, চিচিঙ্গা, টম্যাটো, ঢাঁড়শ, লম্বা লাউ এমনকি ধনেপাতা। ধূপগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট থেকে প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ টন শসা চালান হয় পাটনা, দুর্গাপুর, কলকাতায়। পাঁচ-ছয়জন বড় পাইকার (বাজারের ভাষায় ঢালাই পার্টি) স্লিপ দিয়ে রোজ শসা কেনে। এবছর বাজার বেশ ভাল। দশ-বারো টাকা গড় বাজার রয়েছে। অম্বুবাচি এবং রথের সময় কুড়ি টাকা অব্দি দর উঠেছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে লাগানো শস্য বিক্রি হয় আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত। দেশি প্রজাতির এই শসা খেতে খুব সুস্বাদু। ধূপগুড়ি ব্লকের আলতাগ্রাম, কালীরহাট এবং হরিনখাওয়া অঞ্চলের শসার চাহিদা খুব বেশি থাকে। হাইব্রিড শসার (প্রজাতি মাহিকো, টেস্টি, দেবাশিস) চাষ এখানে কেউ কেউ করে থাকেন। বীজ লাগানোর চল্লিশ দিনের মধ্যে

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি তো কৃষি লোন নিতে দায়বদ্ধ। কিন্তু সঠিক নথি জোগাড় করতে গিয়ে কৃষক নাজেহাল হন। তাই সাধারণ কৃষক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বেসরকারিভাবে চড়া সুদে ঋণ নিতে অভ্যস্ত।

ফল আসে। মাস দেড়েক বিক্রি করা যায়। দেশি শসার তুলনায় খরচ একটু বেশি। তবে লাভও বেশি। লোকাল বা দেশি শসায় খরচ বিঘা পিছু পনেরো-ষোলো হাজার টাকা, বিক্রি হবে হাজার চল্লিশ। আর হাইব্রিড শসায় খরচ কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা, বাজার ভাল থাকলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। সময় লাগছে আপনার আড়াই মাস। যেখানে লোকাল শসার জন্য লাগে প্রায় চার মাস। তবে চাষিদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে একসঙ্গে অনেকে মিলে হাইব্রিড শসার চাষ করা উচিত নয়। কারণ, এ শসার বাজার কিন্তু শুধু পাহাড়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রাজনৈতিক কারণে পাহাড় বন্ধ থাকলে দাম ঠেকে তলানিতে। নভেম্বর মাসে লাগান মালিনী, এপ্রিল মাস ও আগস্ট মাসে লাগাবেন টেস্টি বা মাহিকো জাতের শসা।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার আর একটি অর্থকরি সবজি চাষ হল বেগুনের চাষ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে লাগালে দু'মাস পর থেকেই ফলন শুরু হয়। চলবে একদম শীতের বেগুন ওঠা পর্যন্ত। ঘন ঘন কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। এটাই একটু অসুবিধের। কিন্তু খুব লাভজনক। বর্ষায় খুব চাহিদা থাকে কাঁচা লঙ্কার। জোগান প্রায় নেই বললেই চলে। জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উঁচু জমিতে বুলেট, তেজস্বনী, ফায়ার বম্ব জাতীয় উচ্চ ফলনশীল লঙ্কার চাষ যথেষ্ট মুনাফা দেয়। খুচরো বাজারে একশো টাকার নিচে কোনও লঙ্কা মেলে না। চাষি পঞ্চাশ-ষাট টাকা কেজি দর পায়।

একটা সময় শুধু গরমের দিনে লাউ খাওয়া হত। বাড়িতে বাড়িতে ছোট্ট মাচায় কিংবা ঘরের চালের উপরে লাউ গাছ ওঠানো হত। কিন্তু এখন জমিতে মাচা দিয়ে বা খড় বিছিয়ে সারা বছর লাউ চাষ করা হয়। চাহিদাও থাকে তুঙ্গে। লাগানোর পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ফল আসে। বিশেষ করে সাদা লাউ। অজস্র ফলন হয়। এক বিঘা জমি থেকে এক দেড় মাস প্রতিদিন গড়ে দু'তিনশো করে লাউ তোলা যায়। দশ-বারো টাকা করে পাইকারি দাম পাওয়া যায়। কয়েকটি ভাল প্রজাতির বীজ আছে, ইচ্ছে হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন (পান গার্ড, নামধারী, মাহিকো গার্ড, ইস্ট ওয়েস্ট গাড্ডা এফ ১)।

গ্রীষ্মের শুরুতে যারা ঢ্যাঁড়শ করেন প্রথম দু'সপ্তাহ তিরিশ-চল্লিশ টাকা কেজি পাইকারি দর পান, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দাম দু'টাকা কেজিতে চলে আসে। তাই সবাই একসঙ্গে না করে বর্ষার শুরুতে কেউ কেউ লাগাতে পারেন। দশ টাকার নিচে দাম এ সময় নামে না। ক্ষতির সম্ভাবনা তাই নেই।

করলা আর একটি জনপ্রিয় সবজি। সারা বছরই চাষ করা যায়। অনেক দিন ধরে ফলন দেয়। পাল্লি, পান, চক্র-বিপাশা ১, বিপাশা ২ কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি। চাহিদা বেশি থাকে চক্র বিপাশা ২ প্রজাতির। শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দারুণ বাজার দর থাকে। তাই জৈ্যষ্ঠের শেষ বা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'এ যদি লাগাতে পারেন তো কেল্লাফতে। কারণ ফলন শুরু হয় পঁয়তাল্লিশ দিন বয়স থেকে।

যে কোনও মাচার চাষে (স্থানীয় ভাষায় জাংলা বা জাঙ্গী) প্রাথমিক খরচ বেশি। একবিঘা জমিতে মাচা দিতে মজুরি-সহ প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা খরচ হয়। আগে গোটা মাচা শুধু বাঁশ দিয়ে তৈরি হত। এখন শুধু খুঁটি বাঁশের দিলে হয়, বাকি কাজ তার এবং প্লাস্টিক সুতো দিয়ে করা যায়। এতে খরচ এবং সময় দুই-ই কম লাগে। আর একবার মাচা দিলে সেই জমিতে পরপর তিনটে লতানো ফসল করা যায়। যেমন করলা, লাউ, শসা একটার পর একটা আপনি করতে পারেন।

এ বছর ডুয়ার্সে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেই চৈত্র মাসের প্রথম থেকে। কিন্তু অল্প অল্প করে। অতি বৃষ্টি একনাগাড়ে হয়নি। নিচু জমিতে যারা সবজি করে ছিলেন তারা মার খেয়েছেন। বাকিরা জল সেচের খরচ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। অতিবৃষ্টি না হলেও তিস্তা পারের চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। আলু চাষে সর্বহারা হবার পর যারা পলি মাটিতে বাদাম লাগিয়েছেন তারা অনেকেই জমি থেকে ফসল তুলতে পারেননি। তিস্তা ব্যারেজের জল ছাড়ার কারণে বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছে। গোটা গ্যাংটক, সিকিম, নেপাল, দার্জিলিং-এ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে তিস্তায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শুধু রাজগঞ্জ ব্লকেই কুড়ি হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। জল বেড়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া ও নাথুয়াচর এলাকায়। তিস্তার বাঁধ ভেঙেছে ময়নাগুড়ির সরকারপাড়া, বর্মনপাড়া, বাসুশোভা ও চাতরার পার এলাকা। স্থানীয় মানুষ মনে করছেন সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণে তিস্তা তার স্বাভাবিক গতিপথ বদলে জনপদের উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। নদীর নাব্যতাও অনেক কমে গিয়েছে। ক্রান্তি ও টাকিমারির চর এলাকায় গত দশ বছর থেকে সোনার ফসল ফলছে। তিস্তার উর্বর পলি মাটি এলাকার গরিব মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। ধূ ধূ বালির চর এখন সমৃদ্ধ গ্রাম। পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিসিটি গ্রাম্য জীবনে হাসি এনেছে। কিন্তু এবার আলু বিপর্যয়ের পর তিস্তার ভাঙন মানুষগুলোর জীবনে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

এ মাসে আলিপুর দুয়ার ২, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকদের সঙ্গে কোথাও সাক্ষাতে কোথাও মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ভরা বর্ষায় চাষিদের হালহকিকৎ জানা। প্রায় প্রত্যেকেরই বক্তব্য আমন ধান লাগানো প্রায় শেষ। ডাবল ট্রান্সপ্ল্যানিং (চলতি কথায় 'বলন') করেই এখন ধান লাগায় (বলন বীজতলায় ধান লাগানোর পনেরো কুড়ি দিন বাদে তা তুলে অন্য জমিতে ঘন করে চারা লাগিয়ে তা আবার দিন কুড়ি পরে মূল জমিতে লাগানোর পদ্ধতি)। কিষান ক্রেডিট কার্ড বেশিরভাগ কৃষকের হাতে তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন। ব্যাঙ্ক লোন বা যে কোনও প্রকার কৃষি ভর্তুকির জন্য কে.সি.সি থাকা এখন বাধ্যতামূলক।

সব আধিকারিকের বক্তব্যে একটি অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল; কৃষকরা কেউ আলু চাষ ব্যতিরেকে লোন নিতে চায় না। অথচ ৫০,০০০ টাকা অব্দি লোন নিলে কোনও সিকিউরিটিও লাগে না। ধান বা সবজি চাষের জন্য নিজেরাই বন্দোবস্ত করে নেয়। যেখানে ব্যাঙ্ক লোন দেয় বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদে, তার মধ্যে সরকার ৩ শতাংশ সুদ ভর্তুকি দেয়, অথচ সেখানে সাধারণ কৃষক গ্রামের মহাজনের কাছে যে কোনও প্রয়োজনে মাসিক ৫ টাকা সুদে টাকা ধার করে। এর কারণ কী? ময়নাগুড়ির কৃষি আধিকারিক সঞ্জীব দাস মনে করেন, আসলে এখানকার চাষিদের হাতে জমির পরিমাণ খুব কম। অনেকে হয়তো যৌথ পরিবার থেকে ভাগ হয়ে নতুন জমির মালিক হয়েছেন। তার কাছে উপযুক্ত কাগজ কোথায়? রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি তো কৃষি লোন নিতে দায়বদ্ধ। কিন্তু সঠিক নথি জোগাড় করতে গিয়ে কৃষক নাজেহাল হন। তাই সাধারণ কৃষক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বেসরকারিভাবে চড়া সুদে ঋণ নিতে অভ্যস্ত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা আমাদের মুখে অন্ন জোগাচ্ছেন, ডুয়ার্সের সেই দরিদ্র মানুষগুলি দিন দিন ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছেন।

কৃষ্ণ চন্দ্র দাস

ফালাকাটা আজও স্রেফ একটি বাসস্টপ !

ডুয়ার্সের মানুষের আজ আর অজানা নয় যে সবুজ বনানী ও বন্যপ্রাণ নিয়ে ভাবনার দৈন্যতার কারণেই ডুয়ার্সের সার্বিক উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। ঠিক যেমন পূর্ব ডুয়ার্সের গেটওয়ে হয়েও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা ও সদিচ্ছার অভাবে আজও ন্যূনতম গুরুত্বটুকুও পায়নি ফালাকাটা, যাতায়াতের পথে পাঁচ-দশ মিনিটের বাসস্টপ হয়েই রয়ে গিয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিলেও, শহরের যাবতীয় পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও, এখনও পুরসভা ঘোষণা হয়নি। ডুয়ার্সের অন্যতম মুখ ফালাকাটা। ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্থান তো বটেই গোটা রাজ্য-সহ আন্তঃরাজ্য, আন্তঃরাষ্ট্র যোগাযোগের অন্যতম পথ। ডুয়ার্সের বনাঞ্চল সহ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন পথের দ্রুত যোগাযোগে ফালাকাটা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও অপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকায় এখানকার পরিবহণ ব্যবসাও তেমন সুখকর নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই পথে ফোর লেনের সিদ্ধান্ত নিলেও নানা জটিলতায় তা থমকে রয়েছে। সোনালি চতুর্ভুজের অন্তর্গত এই পথ নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। এই পথে তাঁর চিন্তাসূচি কার্যসূচিতে রূপান্তরিত হলে সত্যিই নতুন দিশা দেখবে ফালাকাটা। এই পথ নির্মাণ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী মহল সহ সাধারণ নাগরিকরা ধোঁয়াশায়। এই পথ নির্মাণের দিক নির্ণয় সহ গোটা বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি। গোটা বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই নানা মত উঠে এসেছে নাগরিক সমাজে। দোকান বাড়ি ভাঙা পড়ার আশঙ্কাতেও ভুগছে অনেকে। সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বৃহত্তর ভাবনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতও রয়েছে। যদিও স্থানীয় বিধায়ক দাবি করেছেন এই জটিলতা কেটে উঠেছে। খুব শীঘ্রই পথের কাজ শুরু হবে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় ফালাকাটার বিশেষ ভূমিকা থাকলেও আজ তা অনেকটাই ম্রিয়মান। খেলোয়াড় তৈরির আতুরঘর অথচ স্টেডিয়াম নেই এখানে, তাই ক্রীড়া চর্চা অনেকটাই বাধাপ্রাপ্ত। তবে এলাকায় একটা উন্নত মানের স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক অনিল অধিকারী। ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গত চার বছরের উন্নয়নের বহু ফিরিস্তি দিয়ে

ফালাকাটার এই পথ একদিকে চলে গেছে শিলিগুড়ি, আরেক দিকে বীরপাড়া, মাদারিহাট, অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙা, কোচবিহার।

আগের চৌত্রিশ বছরের অবহেলার জন্যই যে ফালাকাটা উন্নয়নে গতিশীল হতে পারেনি তা জানাতে ভোলেননি। তাঁর ভাষায় কুঞ্জনগর ও খয়েরবাড়ি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। যানজট সমস্যা দূর করতে একটি বাস টার্মিনাস নির্মাণ এখন ভীষণ জরুরি, তাই সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে বলেও তাঁর দাবি।

দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ফালাকাটায় নির্মিত হয়েছিল একটি ঝা চকচকে কমিউনিটি হল, তৎকালীন বিধায়ক ও সিপিএম-এর রাজ্যসভার সাংসদ তারিণী রায়ের কোটার আর্থিক সহযোগিতা ও কিছু মানুষের দানে গড়ে উঠেছিল এই হল। যদিও সিপিএম-এর কৃষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখেই এই কমিউনিটি হল গড়ে উঠেছিল বলে অনেকের মত, সে যাই হোক ফালাকাটার এই স্থায়ী সম্পদ পরিচালনা করে পঞ্চায়েত সমিতি। ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারি এই হলটির উদ্বোধন করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দেখভালের অভাবে অযত্ন-অবহেলার চিত্র ফুটে উঠেছে সেখানেও।

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার একটি ব্লক ফালাকাটা, ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ব্লকটি এখন আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত। দ্রুত এই ব্লকের একটি বড় অংশকে শহর ঘোষণা করা প্রয়োজন। নগরায়ণ হলে উন্নয়নের একটি নতুন ধারা প্রবেশ করবে ওই জনপদে। নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়ে আইনের ধারা মেনে নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণ কার্যটা অন্তত সম্পন্ন হবে।

পূর্ব ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘিরে ইকো-টুরিজমের নানা ব্যবস্থা। তার আরও সৌন্দর্যায়ন করে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানো যায়। এর ফলে সার্বিকভাবে লাভবান হবে ফালাকাটা। কারণ, অরণ্যে রাত্রি যাপন না করে অরণ্য ভ্রমণে আগ্রহী পর্যটকদের বড় অংশ। ওই ভাবনা থেকে অরণ্যের কিছুটা বাইরে থাকতে চায় জঙ্গল ভ্রমণকারীরা। এক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান ফালাকাটা। বাম আমলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে গ্রামীণ পর্যটন, বন পর্যটনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ডুয়ার্সের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে প্রাক্তন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ যে ভাবনা ভেবেছিলেন তা সেই সময়ে অনেকের কাছে না-পসন্দ ছিল। তবে জঙ্গল নিয়ে বাম আমলেও খুব ফলপ্রসূ চিন্তা হয়েছে বলে মনে করেন না সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মণ। ১৯৯১ থেকে ২০১১ এই দুই দশক ফালাকাটার বিধায়ক ছিলেন যোগেশবাবু। এর মধ্যে পনেরো বছর মন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রথম দশ বছর বনদপ্তর, পরবর্তী পাঁচ বছর অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের এই বিস্ফোরক

স্বীকারোক্তি যে আসলে প্রকৃত সত্য তা আর না বোঝার অপেক্ষা রাখে না। যোগেশ বর্মণ বলেন, তবে বনকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা হয়েছিল সেই সময় আর সেই কারণেই গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পর্যটন কেন্দ্র ও কুঞ্জনগরের মতো চড়ুইভাতি কেন্দ্র। মাদারিহাট, টোটোপাড়া ফুন্টসিলিং প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরের ভাবনা দক্ষিণে গিয়ে অনেক সময়েই মিলিয়ে যায়।

যোগেশবাবুর আক্ষেপ, বনে বরাদ্দ কমিয়েছে সরকার। তাই বর্তমান সময়কালে চিন্তাই হয়ে গিয়েছে ছিনতাই। দেখভালের অভাবে কুঞ্জনগর ও খয়েরবাড়ি আজ মৃতপ্রায় বলে প্রাক্তন বনমন্ত্রীর অভিযোগ। তার আশঙ্কা সেন্ট্রাল জু অথরিটি তাদের অনুমতি এই পরিস্থিতিতে বাতিল করতে পারে। যদিও এইসব দূর ভাবনাকে আমল দিতে চান না বর্তমানের বিধায়ক।

বাম-ডান, বিরোধী ও সরকার পক্ষের তর্ক, বিতণ্ডা সওয়াল যাই থাকুক, সবার মতেই ফালাকাটার সার্বিক বিকাশে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন জনপদ মুজনাই পাড়ের ফালাকাটা পথে-ঘাটে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হওয়া দরকার। ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শঙ্কর সরকার বলেন, পর্যটকদের অন্যতম থাকার স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে আশপাশের সৌন্দর্যকে আরও বাড়াতে হবে। ফালাকাটায় একটি সুপার মার্কেট অত্যন্ত জরুরি। যানজট সমস্যা মেটাতে প্রয়োজন বাস টার্মিনাল। ফালাকাটার সাপ্তাহিক হাট থেকে সবজি বাজার কিষাণ মান্ডিতে স্থানান্তর হয়ে যাওয়ায় সেখানে ব্যবসা মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

একই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতগামী রেল স্টপেজ দরকার ফালাকাটায় বলে মন্তব্য করেছেন ব্যবসায়ী সমিতির এই কর্তা। তাঁর ভাষায় সৌন্দর্যে ভরপুর ডুয়ার্সকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করতে পারলে বাড়বে ফালাকাটার ব্যবসা। বিশেষ করে হোটেল ও রিসর্ট। এর সুফল পৌঁছবে গোটা ফালাকাটার অর্থনীতিতে একই সঙ্গে এর প্রতিফলন ঘটবে উত্তরবঙ্গের পরিবহণ ব্যবসাতেও। সামান্য প্রচেষ্টাতেই ফালাকাটা তার ভৌগোলিক অবস্থানের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারে এ নিয়ে দ্বিমত নেই।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

ময়নাগুড়ির আরেক নাম এখন সমস্যাগুড়ি

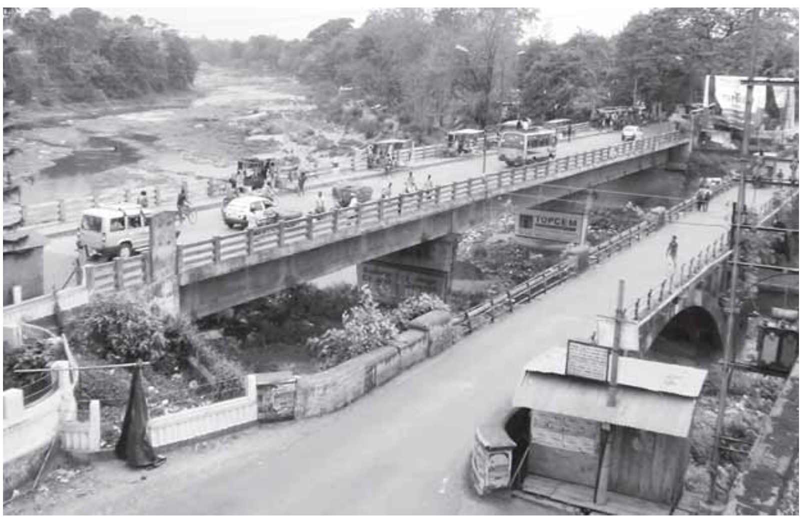

ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার নামেই পরিচিত প্রাচীন জনপদ এই ময়নাগুড়ি। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সম্ভাবনাপ্রবণ এই জনপদ ময়নাগুড়ি আজ নানান সমস্যায় জর্জরিত। ময়নাগুড়িতে অনেক কিছু থেকেও সম্ভাবনাময় ব্লকটি অনেক কিছুতেই পিছিয়ে রয়েছে। নেই-এর তালিকাটি বেশ বড়। নেই পার্কিং ব্যবস্থা, নেই বিজ্ঞানসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা, নেই সুপরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন ময়নাগুড়ির বাজারটিও বর্তমানে জতুগৃহ হয়ে আছে। ফলে যে কোনও সময় কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। সব কিছু জেনেশুনেও নীরব দর্শক পুলিশ ও প্রশাসন।

চলতি বছরের ৭ মে জলপাইগুড়ি দিনবাজারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর সেই শিক্ষা নিয়ে ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ী বা প্রশাসন ময়নাগুড়ির বাজারের জতুগৃহের যে অবস্থা হয়ে আছে তা থেকে কীভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তা নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকলেও সুষ্ঠু সমাধানের কোনও উদ্যোগ কিন্তু নেননি। ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ী সমিতির মুখপাত্র সুমিত সাহা বলেন, 'আমরা ময়নাগুড়ি বাজারের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছি। প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ময়নাগুড়ির বাজারে দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে দমকল বিভাগের কর্মীরা। কারণ, বাজারের গলিগুলি ব্যবসায়ীরা দোকানের পসরা সাজিয়ে যেভাবে আটকে রেখে দিয়েছে তাতে ছোট একটা গাড়ি ঢোকাই দায় দমকল তো দূরের কথা।'

এদিকে, ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল দাস জানান, 'আমরা ব্যবসায়ীদের অনেকবার বিষয়টি নিয়ে অবগত করেছি তারা শোনেননি। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তারাই দায়ী থাকবেন।' অন্যদিকে, ময়নাগুড়ির আর একটি বড় সমস্যা হল যানজট সমস্যা। যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য ২০০৪ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ময়নাগুড়ির নতুনবাজারের বাস টার্মিনাস-সহ শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেও পরবর্তীতে টার্মিনাসের বাস্তব রূপ পায়নি।

ময়নাগুড়ি শহরের নাগরিক পরিষেবা উন্নত নয় বলেও অভিযোগ আছে। পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। ময়নাগুড়ির নতুন বাজারের সেতুতে আগে পথবাতি থাকলেও তা এখন আর জ্বলে না। বিভিন্ন পাড়ায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ। যদিও ময়নাগুড়ি শহরের ৫টি জায়গায় হাইমাস্ট লাগানো হবে বলে জানান ময়নাগুড়ির পঞ্চায়েত প্রধান কমল দাস। পুরসভা করতে চাওয়ার দাবি নিয়ে ময়নাগুড়ি বাসিন্দারা উচ্চকিত অনেকদিন ধরেই। এই শহরকে ডি ক্যাটাগরির পুরসভা করার জন্য ঠিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার, তা এখনও অস্পষ্ট। এ বিষয়ে আগামী 'এখন ডুয়ার্স' বিস্তৃত প্রতিবেদন তুলে ধরবে।

অভিজিৎ বসু

ডুয়ার্সে প্রথম ক্রীড়া গ্রন্থাগার

খেলাধূলার ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে গ্রন্থাগার। শুধুমাত্র ক্রীড়া নিয়ে গ্রন্থাগার তৈরি হওয়াটা ডুয়ার্স অঞ্চলে একটি অভিনব প্রচেষ্টা। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার তৈরির প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হবে। যদিও মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর স্মৃতি গ্রন্থাগারের সূচনা হয়েছে ২০১৩ সালে। রাজ ঐতিহ্যের কোচবিহারে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও মহারাজাদের বড়ো অবদান রয়েছে। ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ। তিনি ১৯৪৪ সালে বাংলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। শুধু ক্রিকেটেই নয়, ফুটবল, লন টেনিস, পোলো, বিলিয়ার্ড, সমস্তরকম ক্রীড়াক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। কোচবিহারের সর্বশেষ মহারাজা ছিলেন তিনি, শুধুমাত্র জগদীপেন্দ্র নারায়ণের সময়কালেই নয়, তার পূর্ববর্তী সময়েও ক্রীড়া অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১১ সালে ব্রিটিশদের পরাজিত করে মোহনবাগান যে আইএফএ কাপ জয় করেছিল সেই দলের ৬ জন ছিলেন তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের খেলোয়াড়। কলকাতার ‘এ’ ডিভিশন-এর বেশিরভাগ ফুটবল দলগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কোচবিহারের মহারাজারা। তাঁদের প্রচেষ্টাতে বেশ কিছু ক্লাবও তৈরি হয়েছিল সেই সময়। এইসব অতীত ইতিহাসকে সামনে রেখেই কোচবিহারের সর্বশেষ প্রশাসক মহারাজার জন্ম শতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই ক্রীড়া গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৫ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণের জন্মের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। ১৯১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নাবালক বয়সেই তিনি কোচবিহার রাজবংশের ২২তম মহারাজা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

জন্ম শতবর্ষে কোচবিহারের এই মহারাজাকে শ্রদ্ধা জানাতে তার প্রতি উৎসর্গ করে ক্রীড়া লাইব্রেরিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চাইছে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কোচবিহার স্টেডিয়ামেই তৈরি করা হয়েছে এই গ্রন্থাগার। ইতিমধ্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার তৈরির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। ডিএমএ-র উদ্যোগে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার বই। খেলার ইতিহাস তুলে ধরতে খেলা সংক্রান্ত বই, নথি বাদেও

ছবি: বাবু শীল

ক্রীড়া সামগ্রীর প্রদর্শনী থাকবে এই গ্রন্থাগারে। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মণ জানান, এই লাইব্রেরি থাকবে সর্বসাধারণের জন্য। ডিএসএ-র মেম্বার বাদেও পৃথকভাবে লাইব্রেরির সদস্য হওয়া যাবে। ডিএসএ সদস্যদের ক্ষেত্রেও পৃথকভাবে সদস্যপদ সংগ্রহ করতে হবে লাইব্রেরি ব্যবহারের জন্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভানুনগরে ভানুভক্ত স্মরণ

১৮৩৬ সালে একদিন যুবক ভানুভক্ত বেড়াতে বেরিয়ে দুই ঘাস কাটিয়ের কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিলেন। তারা অবশ্য নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করছিল। ভানু শুনে ফেলেছিলেন। ঘাস কাটতে কাটতে তারা বলাবলি করছিল যে, জীবনে এমন কিছু একটা দিয়ে যাওয়া দরকার যাতে মরার পরেও কেউ কেউ মনে রাখে। ভানুভক্ত অতি ধনী পরিবারের সন্তান। ঘাস কাটিয়েরা যদি ‘কিছু’ দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে, তবে তাঁর তো করাই উচিত। দিয়ে যাওয়া উচিত এমন কিছু যা তাঁকে অমর করবে।

এই কারণেই তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য ছিলেন নেপালের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। নেপাল ও তাঁর সংস্কৃতির প্রতি উচ্চ অথচ দৃঢ় ধারণা তিনি নাতির মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। যুবকবি মতিরাম ভট্ট যে জীবনী লিখেছিলেন ভানুভক্তের, সেখানে তাঁর সম্পর্কে প্রথম ‘আদিকবি’ বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন জীবনীকার। কিন্তু তিনি ‘নেপালের আদিকবি’—এমন ভাবার কারণ নেই। নেপালে বহু আগে থেকেই কবিতা লেখা হত। মনে রাখতে হবে বাংলা কবিতার আদি নমুনা হিসেবে যে চর্যাপদাবলীর কথা জানি, তার পুঁথি উদ্ধার হয়েছিল নেপালের রাজপরিবারের লাইব্রেরি থেকে।

কিন্তু ভানুভক্তের আগে কেউ সংস্কৃত রামায়ণের নেপালি অনুবাদ করেননি। আর সে

অনুবাদ এমন সহজ-সরল-ললিত যে পরবর্তীকালে নেপালি কবিতা আর ভানুভক্ত সমার্থক হয়ে পরে। গত ১৩ জুলাই সেই ভানুভক্তের ২০১তম জন্মদিন পালিত হল ডুয়ার্সের আরও অনেক জায়গার পাশাপাশি

জলপাইগুড়ি শহরে। পুর এলাকার ১০ নং ওয়ার্ডের আওতায় থাকা ‘ভানুনগর’-এ প্রবেশ পথেই স্থাপিত ভানুভক্তের মূর্তি। প্রায় আঠারো বছর আগে কংগ্রেসি পুরসভার উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল বাসিন্দাদের দাবি মেনে। ভানুনগর এবং তার আশপাশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার নেপালি ভাষাভাষি মানুষ বসবাস করেন এবং এ দাবি ছিল তাঁদেরই।

শহরের দক্ষিণে, পুলিশ লাইনের মাঠ পেরোলেই ডাইনে সেই মূর্তি। রাস্তার বাঁ'দিকটা স্বাধীনতার আগে ছিল সাহেবদের এলাকা। ক্লাব, রেসের মাঠ, উদ্যান, বাগান হর্ম্য এবং শেষে পুলিশ। জেলা গড়ে ওঠার আগেই, যুদ্ধের কারণে সেনা হিসেবে সাহেবদের সঙ্গে নেপালি ভাষাভাষিরা আসতে শুরু করেছিলেন। তারপর পুলিশ ও দেহরক্ষী হিসেবেও আসা শুরু হয়। তাঁদের থাকার জন্য জমি দরকার হলে বর্তমান ভানুনগর তাঁদের জন্য ছেড়ে দেয় শাসকেরা। এলাকাটা তখন স্রেফ জঙ্গল। প্রচুর পরিশ্রম করে এখনকার বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষেরা গাছ কেটে বাঘ-সাপ-শেয়াল তাড়িয়ে জমি পরিষ্কার করেছিলেন। অমানুষিক খেটেছিলেন বলে এলাকাটার নাম প্রথমে হয়েছিল ‘খাটা লেন’।

কবি ভানুভক্তের ২০১তম জন্মদিন পালন করছে নতুন প্রজন্ম।

১৩ তারিখ সকালে শোভাযাত্রা, মাল্যদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় ছিল অতিথি বরণ, ভানুভক্তের রচনার অংশ হিসেবে অনুদিত রামায়ণাংশ পাঠ, গান, নাচ। পুরোটাই নেপালি ভাষা আর সুরে। অতিথি বরণ থেকে শুরু করে যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই দেশীয় মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখে দিনটি পালিত হল। দেশীয় পোশাকের স্বেচ্ছাসেবক, প্রাণ চঞ্চল শিশু আর যুব সমাজের রঙিন ও উচ্ছল প্রদর্শনী দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ভানুনগর বোধহয় নেপালেই।

ভানুভক্তের জন্মদিনে এই আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটি থাকে। সেটা উৎসব ফুরোলেই ভেঙে দেওয়া হয়। ব্যাপারটাকে আরও জমজমাট করে তোলার জন্য বাসিন্দাদের পরিকল্পনার অভাব নেই। কিন্তু সামর্থ্য অতি সীমিত। তাই হয়তো এটা আন্তরিকও।

নিজস্ব প্রতিবেদন

চলে গেলেন কবিতা ও কথাসাহিত্যের দুই শিল্পী

জলপাইগুড়ি শহরের দুই প্রান্তে দু'জন থাকতেন। একজন উত্তরের কবিতাচর্চার প্রবাদপুরুষ বেণু দত্ত রায়, অন্যজন কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর এপ্রিল ’১৫ সংখ্যায় কবি বেণু দত্ত রায় এবং জুন ’১৫ সংখ্যায় কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীকে নিয়ে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা গভীরভাবে শোকাহত উত্তরের এই দুই ভাষাশিল্পীকে হারিয়ে। ২৪ জুন আকস্মিক চোখ বুঁজলেন ওপার বাংলাকে অপরূপ দক্ষতায় তুলে আনবার কারিগর জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে তাঁর হাতে যখন ‘এখন ডুয়ার্স’-এর সংখ্যাটি তুলে দেওয়া হয়, তিনি অত্যন্ত খুশি হন। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘গল্প পঁচিশ’। এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ নিয়ে তাঁর ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন। সারা জীবন ধরে অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন। পূর্ব বাংলাকে বারবার হৃদয়ছোঁয়া মমতায় তুলে এনেছেন। তাঁর খ্যাতি ছিল শিক্ষক হিসেবেও। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ স্বর্গের দুয়ারে কাঁটা, বিতত বিষাদ, অকূল গাঙের নাইয়া, তারপর বৃষ্টি নামল, হিজলপরি রূপকথা, নির্বাচিত গল্প, সোনালি রোদ্দুর পেরিয়ে, সোনার ত্রিশূল ইত্যাদি।

বেণু দত্ত রায় বাংলা কবিতার এক শক্তিশালী কবি। উত্তরবঙ্গের কবিদের কাছে তিনি অভিভাবক। ডুয়ার্সের স্নিগ্ধ সুন্দর নিসর্গ, বন ও বন্যপ্রাণ, এখানকার মানুষজন, নদী, অরণ্য, হাটবাজার ইত্যাদি তাঁর কবিতায় গভীর ব্যাপ্তিতে উঠে এসেছে। প্রকৃতির পাশাপাশি দেশভাগ, দেশচেতনা যেমন তাঁর কবিতায় বিশেষ স্থান পেয়েছে, তেমনি রয়েছে অসংখ্য অতুলনীয় নারী। তিনি বেশ কিছু দারুণ গল্প ও প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে উল্লখযোগ্য কথাকার সমরেশ মজুমদার। আরও অসংখ্য কবি প্রভাবিত তাঁর কবিতায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ‘নজরুল পুরস্কার’-এ সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—শালমহুয়ার দিন, বাঘ জল খেতে আসে আমার উঠোনে, বাংলার চাঁদ দেখে, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ, চেনা শ্রাবণের গন্ধে, জলডাহুকের ডাক শুনেছি, লাল-হলুদ চকোলেটগুচ্ছ, বনপাখির ডাক, করোনেশান ব্রিজে বৃষ্টি, ভালবাসা জঙ্গলে গিয়েছে ইত্যাদি। ৬ জুলাই জলপাইগুড়িতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী ও বেণু দত্ত রায় একসঙ্গে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য বিমা যোজনা সাধারণের অর্থ নয়ছয়ের এক গভীর উৎস

মাস খানেক আগের ঘটনা। মাথাভাঙ্গা মহকুমার পাড়ডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব পাড়ডুবি গ্রাম। চোখ পরীক্ষা শিবির। উদ্যোক্তা কোনও এক বেসরকারি সংস্থা। পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের চোখ অপারেশন হবে। ছানি কাটা। রোগীদের কোনও খরচ হবে না। খরচ সরকারের। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মাধ্যমে। সব ব্যবস্থা উদ্যোক্তা সংস্থার। রোগীদের শুধু স্মার্ট কার্ডটি লাগবে। আপাতদৃষ্টিতে সাধু প্রয়াস। কিন্তু এর মধ্যেই রহস্য এবং অনিয়মের গন্ধ পেলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পাড়ডুবি শাখার সদস্যরা। বস্তুত উদ্যোক্তা সংস্থা কয়েকদিন ধরেই এলাকায় ঘুরে ঘুরে কার্ডধারী বক্তিদের খুঁজছিল শিবিরের জন্য। সন্দেহের শুরু তখন থেকেই। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কার্ড নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে, সে খবর ছিলই। শিবিরের দিন, উদ্যোক্তা সংস্থার কাছে সরকারি অনুমতি সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কিছুই দেখাতে পারেনি। ঠিকানাটিও ভুয়ো। পাড়ডুবি শাখা পুলিশে খবর দিলে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ পত্রপাঠ চিকিৎসক-সহ সংস্থার উপস্থিত সদস্যদের গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

সাধারণ একটি চোখ পরীক্ষা শিবির থেকে এত কাণ্ড হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক লাগতে পারে। এরকম তো কত শিবিরই হয়। এরপরেও বিভিন্ন স্থানে শিবির হয়ে চলেছে। কীসের টানে পরোপকারের এত ঘটা? এক কথায় উত্তর, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। অত্যন্ত গভীর দুর্নীতির উৎস হয়ে উঠেছে এই যোজনা। জনকল্যাণমুখী কোনও সরকারি প্রকল্প অসাধু ব্যক্তিদের হাতে পড়ে কোথায় পৌঁছয় তার অন্যতম নিদর্শন এই যোজনা। আমরা জানি না, ভারত সরকার এই বিষয়ে কতটা অবগত। বা এই দুর্নীতি চক্র ভাঙতে সরকার কতটা উদ্যোগী। অথবা এই যোজনার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে আদৌ দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব কিনা। যোজনার মধ্যেই দুর্নীতির বীজ লুকিয়ে নেই তো? এই বিষয়ে একটু পরে আসছি। তার আগে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক এবং আলোচনার স্বার্থে ধরে নেওয়া যাক এই যোজনার খারাপ দিক কিছু নেই।

২০০৮ সালে ভারত সরকার এই বিমা যোজনা চালু করে দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের জন্য। অন্য যে কোনও স্বাস্থ্য বিমায় বিমাকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমা কোম্পানিকে দিতে হয় প্রিমিয়াম হিসেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রিমিয়াম দেয় ভারত সরকার। বিমাকারীর কাছে থাকে স্মাট কার্ড, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের বিভিন্ন তথ্য সঞ্চিত থাকে। এই কার্ড দেখিয়ে পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্য নিখরচায় চিকিৎসা পেতে পারেন, সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং নথিভুক্ত কিছু বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে। হাসপাতাল বিমা কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত খরচ পেয়ে যায়। বছরের কার্ড পিছু ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া সম্ভব।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিমার সুবিধা পাওয়া যায়? ১) বিভিন্ন সংক্রামক ব্যধি, খাদ্যে বিষক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে হাসপাতালে ভর্তি থাকা প্রয়োজন। ২) চোখের ছানি কাটা, ডায়ালিসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি ভর্তি হওয়ার দরকার নাও হয়। ৩) অধিকাংশ অপারেশনের জন্য 'প্যাকেজ চার্জ' হিসেবে পুরো খরচ পাওয়ার ব্যবস্থা। ৪) প্রসবকালীন খরচ (স্বাভাবিক এবং সিজারিয়ান)। ৫) আগে থেকে কোনও অসুখ থাকলে তার চিকিৎসার খরচও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে আউটডোর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে না, কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া। হাসপাতালে ভর্তির জন্য যাতায়াতের খরচও পাওয়া যায়।

অতএব অস্বীকার করার উপায় নেই দেশের গরীব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রকল্প হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতি তা হতে দিচ্ছে কোথায়? খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নার্সিংহোম, কিছু চিকিৎসক, এনজিও, দালাল, সরকারি কর্মী আধিকারিক ও প্রশাসনের একাংশের অশুভ আঁতাতে রীতিমতো মোচ্ছব শুরু হয়ে গিয়েছে এই প্রকল্প ঘিরে। সরকারি টাকা নয়ছয় হচ্ছে, যা আসলে দেশের মানুষেরই টাকা।

কী রকম সেই দুর্নীতি? প্রথমত, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা শুধুমাত্র দারিদ্র্যসীমা (বিপিএল)-এর নিচে থাকা মানুষদের জন্য। সবার জানা আছে বিপিএল কার্ড নিয়ে কোন পর্যায়ের দুর্নীতি হয়ে থাকে। আবার ২০১২ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে বিমা যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের একশো দিনের কাজের প্রকল্প। ভাল কথা। কিন্তু অনেকেই অন্যায়ভাবে এই প্রকল্পে নিজেদের নাম ঢোকাচ্ছেন, 'জব কার্ড' করিয়ে নিচ্ছেন। অনেক সম্পন্ন ব্যক্তিই এভাবে স্বাস্থ্য বিমা যোজনার নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, সরকারি টাকা লুটেপুটে খাচ্ছে কিছু নার্সিংহোম এবং অসরকারি-বেসরকারি সংস্থা। বিনিময়ে গরীব মানুষ কখনও অল্প বিস্তর চিকিৎসা পাচ্ছেন, কখনও স্রেফ পুরোপুরি ঠকে যাচ্ছেন। এরকমই একটি ঘটনার কথা দিয়ে এই লেখা শুরু হয়েছে। চোখ অপারেশনের নামে গরীব মানুষদের গাড়িতে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের নার্সিংহোমে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ছানি কাটার বা অন্য কোনও অপারেশনের প্রয়োজন বা পরিস্থিতি ছিল কিনা, বা আদৌ অপারেশন হচ্ছে কিনা, এ সমস্ত যাচাই করার কেউ নেই। আবার নির্ধারিত খরচের বেশি টাকাও অনেক ক্ষেত্রে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে কার্ডের টাকার বাইরেও নগদ টাকা নেওয়া হয়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে দু'চোখের ছানি কাটার জন্য ফালাকাটার কোনও এক নার্সিংহোম বারো হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। অথচ এক্ষেত্রে ধার্য নয় হাজার টাকা। মুর্শিদাবাদে ইদানীং প্রচুর বেড়ে গিয়েছে জরায়ু অপারেশন। স্ত্রীরোগবিদরা দিনে দুই-তিনটি করে এই অপারেশন করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া। দক্ষিণ ভারতের একটি বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের অনেক বয়স্ক মহিলারই জরায়ু নেই। এ ধরনের নৃশংস কাজ দেশজুড়ে চলছে। তৃতীয়ত, কেউ হয়ত হলুদ কার্ড নিয়ে দেখাতে গেলেন। প্রয়োজন না থাকলেও ভর্তি করে নিয়ে নামমাত্র চিকিৎসা করে মিথ্যা নথিপত্র দিয়ে বেশি টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। এই অঞ্চলের একাধিক নার্সিংহোম সম্বন্ধেও এই

সব ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন বা পরিস্থিতি ছিল কিনা, বা আদৌ অপারেশন হচ্ছে কিনা, এ সমস্ত যাচাই করার কেউ নেই। আবার নির্ধারিত খরচের বেশি টাকাও অনেক ক্ষেত্রে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে কার্ডের টাকার বাইরেও নগদ টাকা নেওয়া হয়।

অভিযোগ উঠছে। চতুর্থত, আউটডোর চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিথ্যা নথিপত্র দেখিয়ে কার্ড থেকে বেশি টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রে কার্ডধারী রোগীর চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ মিথ্যে বলছেন কার্ড ত্রুটিপূর্ণ বা সঠিক তথ্য নেই বা মেয়াদ উত্তীর্ণ। তারা নগদ টাকা নিচ্ছেন, আবার কার্ড থেকেও তুলে নিচ্ছেন।

গ্রামাঞ্চলের গরীব, সাদাসিধে মানুষকে ঠকাবার বড় একটি হাতিয়ার চলে এসেছে কিছু অসৎ স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীর হাতে। অবিলম্বে সরকার পদক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এবার একটি মূল প্রশ্নে আসা যাক। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনাই কি একমাত্র সমাধান? গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য সরকার যে খরচ করছে, তা সরকারি হাসপাতালে নয় কেন? এতে তো দুর্নীতি অনেক কমবে। খরচও কমবে। বিমা যোজনার লাভ তুলতে নিত্যনতুন নার্সিংহোম গজিয়ে উঠছে। অথচ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত হচ্ছে না। রোগীকে বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় যেতে। আবার সরকারি হাসপাতালে যেটুকু ফ্রি ছিল সেসব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের নাম করে সব লাভ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ বিমার মাধ্যমে সরকার যে টাকা খরচ করছে, তাতে একথা বলা যাবে না যে সরকার টাকার অভাবে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'—এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এগোতে পারছে না। দ্বাদশ পরিকল্পনা আগে যোজনা কমিশন ডাঃ শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বাধীন এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে। এই দলের সুপারিশ ছিল, সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সামান্য বাড়িয়ে সমস্ত স্তরের চিকিৎসা বিনামূল্যে সমস্ত নাগরিককে দিক। তাঁরা স্বাস্থ্য বিমার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু যোজনা কমিশন বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ মানেনি। কমিশনের প্রস্তাব, 'সরকারি খরচে বিমা ব্যবস্থা হোক সব নাগরিকের জন্য।' এতে দেশবাসী কিছুদূর পর্যন্ত লাভবান হবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বিমা কোম্পানি। তারপরেই বেসরকারি নার্সিংহোম এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা। তাহলে প্রশ্ন কিন্তু উঠেই পড়ছে রাষ্ট্রীয় বিমা যোজনা আসলে কার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে?

তন্ময় চক্রবর্তী

তথ্য সহায়তা ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ

(এই প্রতিবেদনটি মাথাভাঙা থেকে প্রকাশিত 'বৈশাখি' পত্রিকার বৈশাখ ১৪২২ সংখ্যায় ছাপা হয়। সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে আবার ছাপা হল)

আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট 'ঝুপড়ি' ঘরে

তিনদিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেড়া। উপরে টিনের ছাউনি। যে ছাউনির একাধিক ফুটো দিয়ে বর্ষাকালে জল চুইয়ে পড়ে। বাঁশের বেড়ার ফুটো দিয়ে এদিক-ওদিকের দৃশ্য দেখা যায় হামেশাই। এমনটাই অবস্থা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট অফিসের। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের জিরোপয়েন্ট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই অবস্থান এই ইমিগ্রেশন চেক পোস্টটির। ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিলে এই 'ঝুপড়ি' ঘরটিতেই গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ সীমান্তবাসীদের অনেকেই বেহাল পরিকাঠামোর পাশাপাশি এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক স্তরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় চলছে অথচ বিষয়টিকে তেমনভাবে গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে নানা ঘটনা শোনার পর এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বহু মানুষের মনে। তাদের দাবি, অবিলম্বে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট অফিসের পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো হোক। পাশাপাশি এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ করা হোক।

জানা গিয়েছে, চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই চেকপোস্ট দিয়ে বৈধ পাসপোর্টধারী দেশ-বিদেশের যাত্রীদের যাতায়াত চললেও এখানে যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত নানা সমস্যা রয়েছে। এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে যাত্রীদের পাসপোর্ট নথিভুক্তকরণ করা হয়। মাঝে মধ্যে যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেলে পাসপোর্ট নথিভুক্তকরণ করতে খানিকটা সময় লেগে যায়। সেক্ষেত্রে যাত্রীদের খোলা আকাশের নিচেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ পোহাতে হয় বর্ষাকালে। কারণ, যাত্রীদের জন্য এখানে কোনও জায়গা কিংবা বিশ্রামাগার না থাকায় সেই সময় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঝুপড়িতেই আশ্রয় নিতে হয় যাত্রী সাধারণকে। বেহাল ভবনের কারণে এই ইমিগ্রেশন দপ্তরের কর্মীরাও রাতে এখানে থাকেন না। প্রতিদিন সকালে জরুরি নথিপত্র তাদেরকে এই দপ্তরে নিয়ে আসতে হয় আবার দিনের শেষে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। যা অনেকটাই সমস্যার। এখানে যাত্রীদের জন্য নেই কোনও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। সম্প্রতি ব্লক প্রশাসনের তরফে এখানে একটি 'টয়লেট ব্লক' চালু হওয়াতে শৌচাগার সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। তবে এখনও মাঝেমধ্যে একটু বসার জায়গা খুঁজে বেড়াতে হয় যাত্রীদের। সবমিলিয়ে নানা সমস্যায় জর্জর চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের উন্নতি ঘটবে অতি দ্রুত সেটাই আশা করে সবাই।

গৌতম সরকার

সোনালি চা-বাগানের শ্রমিক সমবায় হতে পারত এক নতুন সংগ্রামের দিশারী

'চলছে না, চলছে না' পরিচিত ওই শব্দের মধ্যে ডুয়ার্সের চা বাগিচার শ্রমিকেরা যে আওয়াজ তুলতে পারে 'চলছে চলবে'— এমন ধারণা আগে ছিল না। মালিকের খেয়াল খুশিমতো বাগান লুঠ, অসহায় শ্রমিকদের অর্জিত পাওনা আত্মসাৎ, তারপর বাগান বন্ধ করে পালিয়ে যাওয়া এটাই তো এখনকার অভ্যস্ত ইতিহাস। বন্ধ বাগান। শ্রমিকদের কেন দুটো হাতে কাজ নেই। রক্তে এদের চা বাগিচা তথা চা গাছের প্রাণ। এরা জানে না অন্য কাজ। এরা ভাবে না চুরি-ডাকাতির কথা। এদের চরিত্রে নেই তঞ্চকতার কথা। চা-বাগানের সবুজ ঢেউয়ের পরিবেশ এদের স্মৃতির পর্দা থেকে মুছে দিয়েছে— আমি কানু, এ আমার দেশ, আমি সিধু, এ আমার দেশ। ভাবনা দিঘির মহেশ দারাগোর সামনে দাঁড়িয়ে সেই বজ্রগর্ভ বিদ্রোহের ডাকের ইতিহাস। এখানে এরা এসেছিল যেন দধিচীর বংশধর হয়ে চা-কর মালিকদের সুখের প্রসাদ গড়ে তুলতে নিজেদের বুকের পাঁজর দান করতে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা এই আদিবাসীরা এখানে এসেছিল কানু-সিধুর দেশ থেকে। এদের স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্ব পুরুষ বিরশা মুণ্ডা, কানু-সিধুদের বিদ্রোহের অতীতকে। এদের জানানো হয়েছিল তারা হুকুম শুনবে কিন্তু প্রতিবাদ করবে না, এদের পাকস্থলি শূন্য থাকবে কিন্তু খিদা মেটাবার দাবি করবে না, এরা মরবে কিন্তু মারবে না।

চা-সাম্রাজ্যে চলছে এদের ঘাম, রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি। এদের অবস্থান শুধু পিলসুজ বাহকের মতো। এরা মাথায় বযে চলেছে তপ্ত তেলের বাতি আর এদের গা পুড়িয়ে নেমে এসেছে সেই পোড়া তপ্ত তেলের স্রোত। আলোকিত হয়েছে সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণির প্রাঙ্গণ আর এদের শরীর হয়েছে দগ্ধ। এরা ধরে নিয়েছিল এটাই তাদের ভবিতব্য। তাই বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানের সামনে এসে অসহায় দৃষ্টিতে তাদের হাতে পোতা চা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ভিতরে ঢুকে সেই চা গাছগুলিকে স্পর্শ করতে সাহস করেনি, পাছে মালিকের সম্পত্তিতে তাদের হাত পড়ে যায় সেই ভয়ে।

এখানে যে জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দি ওয়াইল্ড'-এর সেই শাশ্বত আহ্বান। দাসত্বের বকলমের বাঁধন ছিড়ে ফেলার আহ্বান যখন সুদূর অতীত থেকে তাদের কানে পৌঁছয় তখন সেই বিদ্রোহের ইতিহাস ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে জানিয়ে দেয় তার প্রকৃত ইতিহাস। চিনিয়ে দেয় তার শক্তিকে। পৃথিবীটাকে তখন সে নিজের অধিকারের চেতনায় বুঝে নিতে এগিয়ে আসে। সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের সামনে যেন সেদিন চিন্ময় ঘোষ জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দি ওয়াল্ড'-এর আহ্বান পৌঁছে দিয়েছিলেন। চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাদের অতীতকে। সেবার ডুয়ার্স শুনেছিল এক নতুন শপথ— 'বাগান বাঁচাও— আপনে বাঁচো, আপনে বাঁচো— বাগান বাঁচাও, খুন-পসিনা জিসকা— চা-বাগান উসকা।' ঘোষিত হল 'লুটনেওয়ালা ভাগেগা— কামানেওয়ালা রহেগি।'

জলপাইগুড়ি অভিযান যেন সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের এক ভিন্ন চেহারায় ফিরিয়ে এনেছিল। বাগানে এসেই তারা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে খোলা জায়গায়

সভা ডাকল। সোনালি চা-বাগানের প্রতিটি শ্রমিকের যেখানে সমান অধিকার। প্রথমেই ঘোষিত হল, তারা বাঁচবে বাগানটিকে বাঁচাবে। বাগানের কাজকর্মের তদারকি করার জন্য সভাতেই নেওয়া হল সিদ্ধান্ত। বাগানের অধিকার শ্রমিকের এই কথাটির সঙ্গে ঘোষণা করা হল, বাবু বলে বাবু কর্মীদের পৃথক করা হবে না। তারাও শ্রমিকের অংশ। বাগানের এই দুঃসময়ে চলে যায়নি এমন দু'জন 'বাবু' কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হল এই কমিটিতে। চিন্ময় ঘোষ সবার দাবিকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে কমিটির সভাপতি হতে রাজি হলেন। সাইমন ওঁরাও হলেন সম্পাদক। বাকি সদস্যরা সবাই বাগানের শ্রমিক। অর্থাৎ 'বাবু' নেতৃত্বের ইউনিয়ন নয়, বাগানটি অর্পিত হল শ্রমিকদের হাতে। সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা অথচ তা যেমন কেউ দাবি করেনি তেমনি কারও উপর খবরদারি করারও কেউ ছিল না। এই শৃঙ্খলাবোধ স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রমিকেরা যখন দেখে তারাই সম্পদ গড়ার কারিগর তখন তাদের দায়িত্ববোধের উপর কোনও পাহাড়াদারির প্রয়োজন হয় না। নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজজীবনের সুশৃঙ্খল জীবন বোধ যে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল সেই তথ্যকেও অস্বীকার করার জায়গা নেই।

বাগানে সকালের কাজের সাইরেন বাজা একটা প্রথা। তাদের হাতে ঘড়ি নেই। সাইরেনই তাদের কাজের সময় জানিয়ে দিত। বাগানে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। পুরনো হাতে চালানো সাইরেনটা সকাল ৬টা ও ৭টায় নিয়মিতভাবে বাজাবার দায়িত্ব সভা করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। বিচিত্র সুর তুলে বাজত সেই সাইরেন। কাজের হিসেব রাখার দায়িত্বও সভা করে প্রত্যেকের উপর পালা করে দেওয়া হয়েছিল। পারিশ্রমিকও তারা ঠিক করে নিয়েছিল। পারিশ্রমিকের উৎস বলতে বাগানের কিছু ঘর ছাউনির ছন ও পুরনো মরা গাছ (জ্বালানি কাঠ) বাইরের লোকের কাছে বিক্রি করে যা পাওয়া যেত তা ভাগ করে নেওয়া। প্রথম দিকে ভাগে পড়ত দৈনিক ৭৫ পয়সা। পরে রোজগারের উপর নির্ভর করে ভাগে পড়ত দৈনিক এক টাকা থেকে দেড় টাকা। শ্রমিকদের অবস্থা যে খুবই অসহায় ছিল তার একটা ঘটনা সমবায়ের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল। এক বৃদ্ধা শ্রমিক ডিসেম্বরের শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসে বলেছিল, 'কামরিট (কমরেড) তানিকুন নোন-রুটিকের বন্দোবস্ত কই দেওয়া। ভুখা সে সহল না যায়।' সেদিন তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যায়নি। তবে যে সমস্ত শ্রমিকদের কাছে একটা রুটি ছিল তার থেকে অর্ধেক তাকে দেওয়া হয়েছিল। তবু এখানকার শ্রমিকেরা যে কোনও মজুরি না পেয়েও বাগানের শীতকালীন কাজ করতে পেরেছিল তার জন্য সহায়ক হয়েছিল তিস্তার জল ও তার বিশাল তীর, ভূমি এবং বনভূমি থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু খাদ্যসামগ্রী। সেখানেও সভা থেকে ঠিক করা হত পালা করে সেগুলি সংগ্রহ করতে যাবে। যা সংগ্রহ হত তা ছিল সমবায়ের সম্পত্তি, ভাগ হত সবার মধ্যে সমানভাবে। সেটা ছিল সেই আদিম সমাজজীবনের সাম্যের এক জীবন্ত ছবি। বাগানের জীবনের অন্যতম অপরিহার্য ও কঠিন কাজ শীতকালীন পরিচর্যার কাজ। এক অমানুষিক পরিশ্রমে তা করা হয়েছিল। তবে যাকে বলা হয় বাগানের ব্যাকরণ মেনে কাজ তা যে হয়নি তা বলাবাহুল্য। তবু আগামী মরশুমে যে কিছু ভাল পাতা আসবে বিশ্বাস তাদের ছিল। শ্রমিকদের নিজস্ব উদ্যোগে যে একটা পরিত্যক্ত মৃত প্রায় বাগানের জীবনের স্পন্দন ফিরে আসতে পারে এটা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। জার্ডিন হেন্ডারসন কোঃ এবং ডানকানের মতো বাগানের ম্যানেজার এই বাগানে ছুটে এসে মন্তব্য করেছিলেন দু'মাসের মধ্যে কোনও যন্ত্র ছাড়া শুধু মানুষের হাত দিয়ে বাগানের এই কাজ ভাবনার বাইরে।

ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলিতে মাঝেমধ্যে শীতকালে কয়েক পশলা বর্ষা হয়ে থাকে। সেটা যদি হয় তবে প্রুনিং করা গাছে স্বাভাবিক সময়ের আগেই পাতা এসে যায়। ১৯৭৪ সালে সোনালি চা বাগানের ক্ষেত্রে তাই ঘটল। তাই কয়েকটি ব্লকে গাছে কচি পাতা দেখা গেল। এই কচি পাতা বিক্রি তখন একটা বড় সমস্যা। সোনালি চা-বাগানে যে ফ্যাক্টরি ছিল না তা আগেই বলা হয়েছে। ফ্যাক্টরি ছিল রুপালি চা-বাগানে। সেখানকার সিআইটিইউ শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃত্ব পরিমল মিত্রের দখলে। চা-বাগান শ্রমিকরা চালাবে তিনি তার ঘোরতর বিরোধী। অন্য মালিকরাও চা-শ্রমিকদের এই উদ্যোগ বানচাল করতে প্রথম থেকেই চেয়ে এসেছে। চা-বাগানগুলিতে তখন আজকের মতোন অন্য বাগান থেকে চা কেনার রেওয়াজ ছিল না। এরকম ঘটনা চা বাগিচার ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। কোনও বাগানের ফ্যাক্টরি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে অন্য বাগানের মালিকেরা মালিক সংহতি দেখাতে তখন হয়ত সাময়িকভাবে সেই বাগানের কাচা পাতা নিত। দাম ঠিক হত আপসে। সেন্ট্রাল এক্সাইজকে শুধু তা জানিয়ে দিলেই হত।

সোনালি চা-বাগানের অন্য ব্লকের চা গাছগুলিতেও কচিপাতা আসতে শুরু করল। খদ্দের নেই। শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর হতাশা। রাজ্যে তখন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডা. গোপাল দাস নাগ। তার কাছে আলিপুর দুয়ারের বিধায়ক ও আরএসপি নেতা (পরে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারে স্বাস্থ্য ও সেচ দফতরের মন্ত্রী) ননী ভট্টাচার্যকে নিয়ে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তার কাছে যাওয়া হল। ড. গোপাল দাস নাগ শ্রমিক রাজ কায়েমের কথা বলেননি। আদ্যপ্রাপ্ত কংগ্রেসি। অথচ একটা পরিত্যক্ত বাগানের শ্রমিকেরা সরকারি সাহায্য ছাড়াই সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে শুনে বিধানসভা ভবন থেকে ডানকান হাউসের গৌরি গোয়েঙ্কাকে ফোন করে সোনালির কাঁচা পাতা যাতে নষ্ট না হয় তা দেখতে অনুরোধ করেন। এই ডানকানই ছিল সোনালি চা-বাগানের প্রথম মালিক। এদের বাগান ছিল বাগরাকোট। তারাই হল সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের কাঁচা পাতার প্রথম ক্রেতা। দাম ছিল কেজি প্রতি ৬০ পয়সা। তখন বাগান শ্রমিকদের দর কষাকষির কোনও ক্ষমতা ছিল না। পরে অবশ্য এর দাম উঠেছিল কেজি প্রতি ৮০ পয়সা।

এবার এল ডুয়ার্সের চা-বাগানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারি ঘটনা। শ্রমিকেরা সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিল, গঠন করা হবে শ্রমিক সমবায়। সে সময় জলপাইগুড়ি সমবায় দপ্তরের সহকারী নিয়ামক ছিলেন এক তরুণ যুবক এন কে মাইতি। তার কাছে শ্রমিকদের আবেদন পৌঁছানো মাত্রই জেলা শাসকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর্বটি সেরে পূর্ব নির্ধারিত একটি দিনে মালবাজার এলাকার কো-অপারেটিভ ইনস্পেকটরকে সঙ্গে করে শ্রমিকদের সাধারণ সভায় যোগ দিলেন। আজকে সরকারি আধিকারিকদের আমলাতান্ত্রিক হৃদয়হীনতা নিয়ে নানা অভিযোগের মধ্যে সেদিনের এন কে মাইতির এই উদ্যোগ অবশ্যই এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক শ্রমিক-সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন এই বাগানের বড়বাবু রেবতীমোহন সাহা। জেলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় ঘোষ শ্রমিকদের পিছনে থেকেই তাদের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সভায় চা বাগান পরিচালনার জন্য গঠিত হল 'সাঁওগা টি অ্যান্ট অ্যালায়েড প্ল্যানটেশন ওয়ার্কাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' নামে শ্রমিক সমবায়।

১৯৭৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সমিতি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি'স অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুসারে রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। 'অ্যালায়েড প্ল্যানটেশন' কথাটি রাখার পিছনেও ছিল একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য। এ বাগানে চা আবাদের পাশাপাশি প্রায় দু'শো একর জমি পতিত হয়ে পড়েছিল। সেখানে আদা, কলা, আনারস, হলুদ এবং বনৌষধি চাষ করে যাতে শ্রমিকরা অর্থকরী ফসলের চাষ করার সুযোগ নিতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই অ্যালায়েড প্ল্যানটেশন কথাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রবীণ নর-নারীদের কাছ থেকে

ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ গড়ে তার স্কুল

বাবা-মায়েরা চেষ্টা করেন সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠা পায়। সমাজের একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস হয়। তাই তাদের বাচ্চার স্কুলিংটা যাতে ঠিকঠাক মতো হয়, এমন স্কুলের খোঁজ বাচ্চার বয়স তিন-চার পেরানোর আগেই শুরু হয়ে যায়। এ ধরনের স্কুলের সংখ্যাও আজকাল বহু ও যত্রতত্র। তবে স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে খরচ যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার, তেমনই কোন স্কুল তার সন্তানের পক্ষে যথপোযুক্ত সেই ভাবনাতেও যথেষ্ট পর্যদুস্ত হন অভিভাবকেরা। নামীদামী স্কুলের সংখ্যা তো কম নয়, কিন্তু তা সকলের সামর্থ্যের মধ্যে নয়। এরপর যে স্কুলগুলি থাকে তার মধ্যে থেকে সন্তানের ভবিষ্যত তৈরি করার মতো উপযুক্ত স্কুলটি নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কেউ দেখেন স্কুলের শেষ কয়েক বছরের ফলাফল। কেউ স্কুলের ডিসিপ্লিন, কেউ জোর দেন স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিতে। আসলে সন্তান যাতে সেই স্কুল থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি লাভ করতে পারে এবং তার ভবিষ্যত অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে— এমন একটি শিক্ষায়তনের সন্ধান পেতে চান সব বাবা-মায়েরাই।

বাবা মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান লেখাপড়া শেখাতেই। আর সেই সঙ্গে তারা এই আস্থাও রাখেন যে স্কুলের দেখানো পথেই বাচ্চারা শিক্ষা লাভ করবে। সব অভিভাবকই চান তার সন্তান যেন স্কুল থেকেই ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে চলার পথের দিশাও যেন সঠিকভাবে পেয়ে যায়। আর পাঁচটা নামি দামি স্কুলের থেকে পুরোপুরি আলাদা 'নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল'।

যেখানে শিক্ষকরা ছাত্রদের শৈশবস্থা থেকেই লক্ষ্য রাখেন কোন দিকে তাদের ঝোঁক বেশি, কোন বিষয়ের প্রতি তাদের বেশি কৌতূহল সেই দিকে। শিশু বয়সে উৎসাহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসল কথা হল সেই ঝোঁক বা কৌতূহলকে জিইয়ে রাখা আর তাদের উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের পছন্দের বিষয়কে ভালবাসতে শেখে, যত্নবান হয় সেদিকেও খুব খেয়াল রাখেন নর্থ পয়েন্টের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলটি দাঁড়িয়ে আছে তার আদর্শ, শিক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র-শিক্ষককের সম্পর্কের ভিত্তিতে। এখানে আদর্শের মানে ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা। যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের দেশীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি উৎসাহী এবং শ্রদ্ধাবান হয়। ভবিষ্যতে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করে। যাতে তারা যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং মানবিক গুণ অর্জন করে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার লক্ষ্যেই সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। লক্ষ্য রাখেন যাতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তাদের পছন্দের বিষয়টিতে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার জানান, ছাত্রের মনোভাবকে জেনে বুঝে নিতে শিক্ষকের ঐকান্তিক মনোভাব জরুরি। তেমনি তাকে উদ্যমী করে এগিয়ে নিয়ে যেতেও ছাত্রের আস্থা অর্জন করতে হয়। তা না হলে উৎসাহী ছাত্র শিক্ষককে বিশ্বাস করবে কেন, কেনই বা সেই ছাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হবে।

Since-1996

NORTH POINT RESIDENTIAL SCHOOL

Under "Maa Gita Devi Educational Society" AFFILIATED TO CBSE (Affiliation No. 2430150)
An ISO 9001:2008 CERTIFIED RESIDENTIAL SCHOOL | THE BEST BOARDING CUM DAY BOARDING SCHOOL

আগেই জেনে নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে কখন কোন চাষ লাভজনক ফল দিতে পারবে। এই সমবায়ের আরও একটি উদ্দেশ্যের কথা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ভবিষ্যতে চা বাগানের মধ্যেই একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করে সেখান থেকেই বাগানের কাঁচা পাতা থেকে চা তৈরি করা হবে। সেই চা সারা দেশের অসংখ্য সমবায়িকা হোলসেল কনজিউমার্স স্টোর্স, অল ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশনের মাধ্যমে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হবে। যাকে বলা হয় 'কো-অপারেটিভ প্রোডাকশন টু কো-অপারেটিভ মার্কেটিং। এই ব্যবস্থার সুবিধা হল এখানে দালাল, নিলামবাজ বা তৃতীয় পক্ষের কোনও ভূমিকা থাকে না।' এই সমস্ত তৃতীয় পক্ষের পেটেই চলে যায় ২৫-৩০ শতাংশ অর্থ নানা কমিশনের নামে। সেটি বেঁচে যাবার ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে উৎপাদক বিক্রেতা এবং ভোক্তা ক্রেতা।

এই অর্থ সাশ্রয়ের তাৎক্ষণিক সুবিধা ছাড়াও অপর একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। শুধু চা শিল্পেই নয়, সমস্ত উৎপাদক শিল্প ঘিরে যে দালাল, ধাপ্পাবাজ, শোষক, প্রতারকরা নানাভাবে উৎপাদক বিক্রেতা এবং ভোক্তা ক্রেতাদের প্রাপ্যের উপর ভাগ বসায়, তাদের উৎখাত করতে পারা যাবে। শ্রমিকদের সকলের কাজের এমন তলানি পড়ে যা অত্যন্ত উর্বর বহু দিশাযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ ওইসব তৃতীয়পক্ষ সেই তলানি জমা হবার আগেই তাকে চেটেপুটে খেয়ে নেয়। সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকেরা এমন একটা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই আদর্শ মানব সমাজের স্বপ্নের কথা বললেও তারা যে দু'ধরনের স্বপ্ন দেখতে পারে সেটা তো এখানকার কায়েমি স্বার্থের বাহকদের চোখে চরম ধৃষ্টতা বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

সাঁওগা শ্রমিক সমবায়ের চলা শুরু

শিল্প-সঙ্কট শুধু চা শিল্পেই নয়, এই সঙ্কট সারা বিশ্ব জুড়ে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা খোলা নিয়ে আমাদের দেশে তো বটেই খোদ আমেরিকা-ইউরোপেও অনেক ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। বা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ— এই দু'টি বিষয় নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছিল। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হচ্ছে শ্রমিক সমবায়। আমাদের দেশে সত্তর দশক থেকেই চা, চট, বস্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং, কয়লা ইত্যাদির মতো শিল্পে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তাকে মোকাবিলা করতে সরকারের পক্ষে কিছু জাতীয়করণ ও কিছু টেকওভার করার চেষ্টা হয়েছিল। সাধারণভাবে তা লাভজনক না হওয়ায় সরকার এই পথে আর এগোতে চায়নি। অন্যদিকে, আমাদের প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও খুলতে হবে দাবি তুলে মিছিল, কৌটা ঝাঁকিয়ে পয়সা তোলা তারপর হতাশ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু বন্ধ কারখানাটিকে শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে যে চালু রাখা যায়, সেকথা মনে হয়নি। সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গড়ার সিদ্ধান্তটি যে এক ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত তা নিয়ে একটু তত্ত্বগত আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ অথবা কোনও ব্যক্তি মালিকানার হাতে বন্ধ কারখানাটি তুলে নিয়ে সমাধান করতে পারলে সমবায় গঠনের প্রয়োজনীয়তা হয় না। সমস্যা তো দুটো—কাজের নিশ্চয়তা ও উৎপাদন চালু রাখা। সামাজিক এই নিরাপত্তা দেওয়ার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র যখন তার অক্ষমতার কথা জানায় তখনই কর্মহীন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের ডাক ওঠে, বিকল্পে সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের মতো ঘোষণা করতে হয় আমাদের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা এই সংস্থাকে আমরাই বাঁচাব। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জেমস ই মিয়েড তার 'Stagflation' তত্ত্বে বলেছেন, 'Labour Co-Operative are designed to ged rid of the conflict between 'them' and 'us' between 'owners' or 'bosses' on the one hand and workers on the other hand. It is for this reason of coping with the problems of explosive inflationery wage pressure.' একই সঙ্গে অবশ্যই তিনি জানিয়েছেন, শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আশা করা যায় না। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে তা নিশ্চয় সহায়ক হবে।

১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বাগিচা শিল্পের উপর সমীক্ষার জন্য আইসিএস পি মাধব মেননের নেতৃত্বে গঠন করেছিলেন এক তদন্ত কমিটি। ১৯৫৬ সালে মেনন কমিটি তাদের যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন সেখানে তারা গুরুত্বপূর্ণ ১০টি সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশের মধ্যে অন্যতম সুপারিশ ছিল ছোটো বাগানগুলিতে সমবায় গঠন। তবে এটাও মনে রাখা দরকার, বড় বাগানগুলিও যেমন নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে তেমনি ছোট বাগিচাগুলিও পরিচালন দক্ষতার জন্য লাভজনকও হতে পারে। মেনন কমিশনের ওই সুপারিশকে মান্যতা দিয়ে তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে এবং হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় ছোট ছোট চা বাগিচা মালিকদের নিয়ে সমবায় গঠনে সে সমস্ত রাজ্যের সরকার এগিয়ে এলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শ্রমিক সমবায় সংগঠনকে কোনও ভাবনাতেই জায়গা দেওয়া হয়নি।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গে যখন চা-বাগিচাগুলিতে লক আউট, বন্ধের ঘটনা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন চা শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে রুগ্ন, আধা রুগ্ন, আধা বন্ধ এবং বন্ধ বাগানগুলির মূল সমস্যাগুলির সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই অবস্থা থেকে গেল অপরিবর্তিত। ওই সময়ে মূল শ্রমিক সমবায় বা ওয়ার্কস কো-অপারেটিভ আইনের উপর সংশোধনী এনে শ্রমিক সমবায়কে রেটিভ আইনের উপর সংশোধনী এনে শ্রমিক সমবায়কে একটি আইনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে কার্যকরীরূপ দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না। অথচ সেই প্রস্তাবে যে সংশোধনী দেওয়া হয়েছিল তাকে মান্যতা দিলে চা-বাগিচা শিল্পের শ্রমিকদের জীবনে ঘটত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রস্তাবিত সংশাধনীর সার কথা ছিল, সকল কর্মরত শ্রমিকদের সমসংখ্যক শেয়ার ও সকলের জন্য থাকবে একটি করে ভোট। বাইরের কারও ভোটের অধিকার থাকবে না, তবে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির ভোট ক্রয় করতে পারবে। এই সংশোধনীর প্রস্তাব অনুসারে বলা যেতে পারে সাঁওগা শ্রমিক সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে ১০০ বছর আগেই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করেই সমবায় গঠনের কথা বলেছিলেন। আমরা কিন্তু বিশ্বকবির সেই ভাবনাকে ধারণার মধ্যেই ধরে রেখেছি, বাস্তবায়িত করার জন্য সংগঠিত আন্দোলন বা ভাবনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিনি। অথচ পশ্চিম ইউরোপের বহু জায়গাতেই এই ভাবনাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সফলতাও এসেছিল। তবে এর বেশিরভাগই কৃষি, পশুপালন, ছোট উৎপাদক এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে আবার আমাদের সব ভাবনার পোতাশ্রয় রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলিকেই আমাদের ভাবতে হয়।

তিনি জানিয়েছেন, 'বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা কিছু দামি এবং বড় তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে।... অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই ইউরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই সেই প্রণালী একদিন বড় হইয়া উঠিবে।'

‘ভাগো নেহি, দুনিয়া বদলৌ’

মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের সেই বিখ্যাত বই সোনালি চা বাগানের শ্রমিকেরা পড়েনি। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজার মতো ট্রেড ইউনিয়ন করতে আসা অথচ ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যবসা ভাবতে না পেরে শ্রমিক কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ চিন্ময় ঘোষ রাহুল সংকৃত্যায়নের ভাবনার কেন্দ্রে প্রবেশ করে শ্রমিকদের বোঝাতে পেরেছিলেন ‘পালিয়ে যেও না, বাগানের মালিকানা বদলে বাগানটাকেই পাল্টে দাও।’

শ্রমিকেরা জানত বাগান থেকে পলাতক খেমকা ভ্রাতারা পাওনাদারের ভয়ে বাগানে আসবে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা শ্রমিকদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে কলকাতায় বশে বাগান থেকে টাকা পেয়ে যাওয়া। তাই তারা একটা চুক্তির বয়ানপত্র পাঠিয়ে নেতাদের তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য কলকাতায় ডেকে পাঠান। তাদের সেই চুক্তিপত্রের বয়ানে ছিল, ‘গ্রেট গোপালপুর টি কোম্পানির সর্বমোট দেনার পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা। ভূমিরাজস্ব, টি বোর্ড ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন, রেশন, বোনাস, পি এফ, গ্র্যাচুইটি ছাড়াও বিভিন্ন সরবরাহকারীদের বাজার দেনা। সম্পত্তির পরিমাণের তুলনায় দেনার পরিমাণ অনেক বেশি। তাই তাদের পক্ষে স্বনামে বা বেনামে বাগানটি চালানো সম্ভব নয়। সেইজন্য ‘এভার গ্রিন টি কোম্পানি’ নামে একটি নতুন কোম্পানি খুলে তার কাছে স্রেফ কাগজপত্রে বর্তমান কোম্পানিটি বিক্রি করে দেওয়া। এই নতুন কোম্পানি সোনালি চা-বাগানের কর্মীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নতুন চুক্তি করবে। এই চুক্তির প্রথম শর্ত শ্রমিকেরা তাদের আগের কোনও পাওনার দাবি করতে পারবে না। বাগানটি চালাবে ইউনিয়ন, তার জন্য খেমকাদের বছরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিতে হবে। কোম্পানির মালিকানার অধিকার বলে খেমকারা ইউনিয়নকে সর্বোতভাগে রক্ষা করবে। অথচ খেমকারা যে নতুন কোম্পানির মালিকানার নাম তথা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস হিসেবে উল্লেখ করেছিল তাতে খেমকাদের কারও নামই ছিল না। শ্রমিকেরা কিন্তু খেমকাদের এই অভিনয় প্রথমে ধরতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে সরল শ্রমিকদের কাছে তাদের বাঁচার তাগিদে এটা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছিল। চিন্ময় ঘোষ চা-মালিকদের ভূমিকাকে এত সহজে বিশ্বাস করতে পারেননি। তার পরামর্শেই শ্রমিকেরা তাদের জানাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর যদি এই চুক্তিপত্র দেখে তাদের সম্মতি দেয় তবেই তারা ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে।

খেমকারা ছিলেন চমৎকার অভিনেতা, একইসঙ্গে তারা ধরে নিয়েছিল তারা সব কিছু ম্যানেজ করার ক্ষমতা রাখে। তারা এক্ষেত্রে শ্রমিকদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার তখন এন সি কুণ্ডু। তার সদর দপ্তর নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে। মধ্যবয়স্ক এই সরকারি আমলা তার দায়িত্ববোধের জন্য সুনামের অধিকারী ছিলেন। শ্রমিকরা ধরে নিয়েছিল কুণ্ড সাহেব যদি এই চুক্তিপত্রটি দেখে সঠিক মনে করেন তবে তারা মেনে নেবে এবং ধরে নেবে এই ধরনের চুক্তিতে সরকারেরও সমর্থন আছে। কুণ্ডু সাহেবের ঘরে ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। খেমকা তাকে তার বাক্‌চাতুর্যে চুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা দিল। কুণ্ডু সাহেবের অভিজ্ঞ চোখে খেমকাদের বাক্‌চাতুর্যের জালিয়াতি ধরা পড়তে সময় নিল না। রাজনৈতিক নিরপেক্ষভাবে কাজের ক্ষমতা পেলে আমলারা যে জনমুখী কাজের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন তার উদাহরণ অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার এন সি কুণ্ডু। তিনি বেয়ারাকে ডেকে খেমকাদের তার ঘর থেকে বের করে দিতে বললেন। তিনি শ্রমিকদের কাছে খেমকাদের পাতা ফাঁদগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রমিকদের মধ্যে যাদের মনে একটা দ্বিধা ও খেমকাদের প্রতিশ্রুতির উপর একটু বিশ্বাস ছিল সেই দ্বিধা ও বিশ্বাসকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তারা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ফিরে এসেছিল। ১৯৭৫ সালে কুণ্ডু সাহেব বিনা নোটিশেই ডুয়ার্সের এই প্রথম চা-সমবায়টি পরিদর্শনে এসে দপ্তরের কাগজপত্র পরীক্ষা সহ প্রতিটি শ্রমিক লাইনে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সহ সরকারের নানা দপ্তরের এই সমবায়কে সাহায্য করার সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে এই কোম্পানির অপর বাগান রুপালি নিয়ে একটা দুটো কথা বলা দরকার। সেখানকার ইউনিয়নটি ছিল সিআইটিইউ নেতা পরিমল মিত্রের নেতৃত্বাধীন। তারা কিন্তু খেমকাদের সঙ্গে দিব্যি আপস করে নিল। কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের নিয়ম অনুসারে ম্যানেজমেন্টের চালানে সই করে ফ্যাক্টরির মজুদ চা বের করতে হয় এবং সেই চালান দেখে শুল্ক দপ্তর তাদের শুল্ক আদায় করে। তখনও কাগজ কলমে বাগানের ম্যানেজমেন্ট খেমকারা। ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে তারা কলকাতায় বসেই ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে বাগানের চা বিক্রির ছাড়পত্রে সই করেছিল। এই চা-গুলি ছিল ব্যাঙ্কের বন্দকি সম্পত্তি। যা বিক্রির জন্য ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের অনুমতি নেওয়া হল না এবং ব্যাঙ্কের ঘরে এক পয়সাও জমা পড়ল না।

সোনালি চা-শ্রমিকেরা কিন্তু সঙ্কল্প নিল তারা মালিকের কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দাঁড়াবে না। তারা প্রতিষ্ঠা করবে তাদের অধিকার। হাতিয়ার শ্রমিক সংহতি ও সমবায়। ৯ জন সদস্য নিয়ে বাগান পরিচালনার জন্য গঠিত হল ম্যানেজিং কমিটি। হাতে নেই অর্থ। বাগানে ফ্যাক্টরি নেই কাচা পাতাকে চা-এ রূপান্তরিত করার জন্য। মূলধন বলতে অদম্য মনোবল। ১৫ ডিসেম্বর শুরু হল বাগানের কাজ। তার আগে জনসভা করে বার বার বোঝানো হল তাদের দায়িত্ব। এ যাত্রা চাকরির যাত্রা নয়। এ যাত্রা জীবন যুদ্ধের যাত্রা। সর্বত্র প্রতিপক্ষ। সরকারি পদ্ধতি তাদের প্রতিপক্ষ। আশেপাশের মালিকেরা অভিমুন্য বধের মতো চক্রব্যূহে তাদের প্রতিপক্ষ। এমনকি শ্রমিকের নামে যারা ট্রেড ইউনিয়নকে ট্রেডে পরিণ করে রাজত্ব চালায় তারাও তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ। তার থেকেও কঠিন প্রতিপক্ষ তাদের এতদিনের অভ্যাসে দাসত্বের ভাবনা। এতদিনের রীতিনীতি ও অভ্যাস বদলানো যে প্রচণ্ড কঠিন কাজ। এরা হুকুম শুনে কাজ করতে অভ্যস্ত। নিজেদের পরিশ্রমে সম্পদ সৃষ্টি হলেও সেই সম্পদের মালিকানার দাবি করতে তারা শেখেনি। এক সময় তারাই যে ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক সেই ইতিহাস তাদের মন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে।

বাগানের মালিকের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ হয় না। মালিকের হয়ে বাগানের ম্যানেজার হুকুম করে। ম্যানেজার না থাকলে সহকারী ম্যানেজার তারপর বড়বাবু। সেখান থেকে সর্দার। এবার তো বাগানের ম্যানেজার নেই। নেই বড়বাবু, নেই সর্দার। বাগানের শ্রমিকরাই যে সব। তারাই মালিক। হুকুম দেবে কে? কাজের খবরদারী করবে কে? ন্যুনতম শৃঙ্খলা রক্ষা করবে কে? সপ্তাহান্তে মজুরী চাইবে কার কাছে? সব কিছুর দায় যে তাদেরই। এটা একদিকে যেমন অবাধ স্বাধীনতার এক অনাস্বাদিত অনুভূতি তেমনি যে সেই স্বাধীনতার এক গভীর সমস্যার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। নেতা একজন চাই। জলধারাকে যেমন খুশি তেমনভাবে গড়াতে দিলে মুশকিল, তার জন্য চাই একটা নির্দিষ্ট গতিপথ, নয়ত নদীর সৃষ্টি হয় না। সময় ও বাস্তবতা তাদের যেন পিছন থেকে সজোরে আঘাত করে সামনের দিকে ঠেলে দিল। জনসভা থেকেই নির্বাচিত হল তাদের নেতা। সাইমন ওরাওঁ। তাকেই দেওয়া হল বাগানের ভার। অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হল বাগানের প্রবীণ কর্মী রেবতীমোহন সাহা'র হাতে। প্রয়োজন হল না কোনও নিয়োগপত্রের। শ্রমিকেরা আদিবাসী। আদিবাসী সমাজে প্রয়োজন হয় না আইন কাগজপত্রের। যা তারা সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই নিয়ম। সেটাই বিশ্বাস। শুরু হয় ডুয়ার্সের চা-বাগানের ইতিহাসে এক নব যুগের ডাক।

সৌমেন নাগ

ছবি : প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

অনুপমা ডুয়ার্স

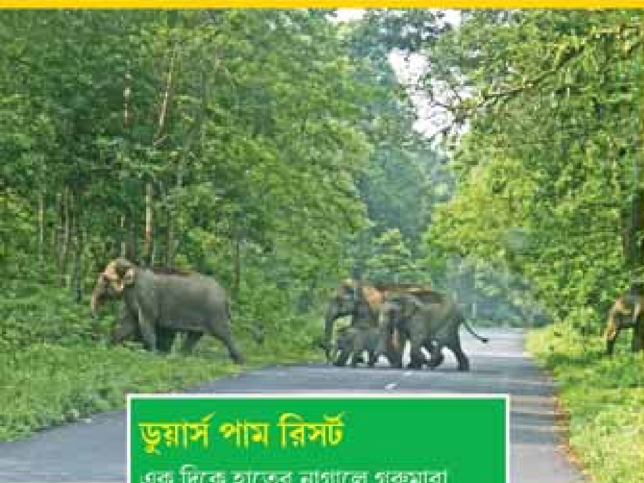

ডুয়ার্স পাম রিসর্ট

এক দিকে হাতের নাগালে গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের গেট, অন্য দিকে খানিক এগলেই মূর্তি পেরিয়ে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। চালসা-ময়নাগুড়ি হাইওয়ের উপরেই এক ফালি চা বাগানের মধ্যিখানে এই রিসর্টে পৌঁছনো বোধহয় সবচাইতে সোজা। শিলিগুড়ি, মালবাজার, আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার যে কোনও প্রান্ত থেকেই পৌঁছতে সময় লাগে দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা। বছরভর একই রকম উদ্দীপনা ও আতিথেয়তা নিয়ে খোলা থাকে এই রিসর্ট। শহরের মানুষদের জন্য নিরাপদে থাকা, খাওয়া ও প্রকৃতিকে উপভোগ করার একটি আন্তরিক আয়োজন। কেবল পুজো বা বড়দিন কিংবা দোলের ছুটিতেই নয়, যে কোনও উইকএন্ডে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলে ডুয়ার্স পাম রিসর্ট হতে পারে আপনার পছন্দের ঠিকানা।

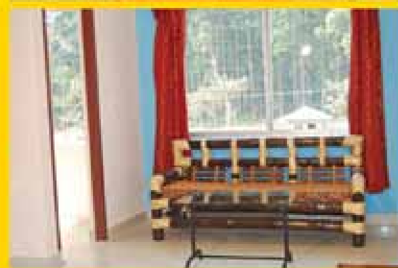

DOOARS
PALM RESORT

LODGING | FOODING | PACKAGE TOUR

• Comfortable Rooms (AC/Non-AC) • Running Hot & Cold Water
• Multi Cuisine AC Restaurant • Conference Hall

Centrally located between Gorumara NP & Chapramari WLS

East Batabari, Chalsa, Dist. Jalpaiguri
Phone: 9434376466, 9832501328
Mail: dooarspalmresort@gmail.com

ছিটমহলের ছেঁড়া কথা

চুক্তি সমাপণ হয়েছে আগেই, সেই অনুযায়ী জনসমীক্ষার পর্বও সারা হয়েছে। কিন্তু দুই বাংলারই সাধারণ মানুষের অজানা হয়ে গেছে পেছনের নানা রোমহর্ষক তথ্য, যা কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায়।

দ্বিতীয় পর্ব

জঙ্গলের রাজত্বই বটে। সেখানে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। অবশ্য বিচার থাকলে তো তার বাণী। আর কাঁদা বা না কাঁদা—সে তো পরের পর্ব। যাই হোক এ পর্বে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন নাজিরগঞ্জ ছিটমহলের আদি বাসিন্দা শরৎচন্দ্র রায়। শরৎবাবুর পরিবারের বাস কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অধীনস্ত ৪১ ও ৪২ নং নাজিরগঞ্জ ছিটমহলে। বাংলাদেশের বর্তমান পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার অভ্যন্তরে অবস্থিত নাজিরগঞ্জ নামাঙ্কিত মোট ১৮টি ছিট খণ্ডের অস্তিত্ব সরকারি নথিপত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই ১৮টি ছিটের মোট জমির পরিমাণ ৭৯২.২২ একর। অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৪ শত বিঘা। ৪১ ও ৪২ নং নাজিরগঞ্জে শরৎবাবুর পরিবারের পূর্বপুরুষ জয়গোবিন্দ রায়ের প্রায় ৯ শত বিঘা জমি ছিল। জয়গোবিন্দ রায় ছিলেন কোচবিহার মহারাজার অধীনে জোতদার। হয়ত বা জয়গোবিন্দবাবু ছিলেন কোচবিহার রাজদরবারের নাজির অর্থাৎ সেনাপতির বংশধর। কারণ, ইতিহাস অনুসন্ধানে যেটা জানা যায় তা হল, প্রাচীন কোচবিহার রাজপরিবারে যিনি রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিদের থেকেই রাজ্যের দেওয়ান ও নাজির মনোনীত হতেন। আর আমরা প্রাচীন ইতিহাসে এটাও দেখতে পাই যে, এই সকল ছিটমহল যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এলাকার অন্তর্গত। এই চাকলা তিনটি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কোচ-মোগল সন্ধির শর্ত অনুসারে মহারাজ রূপনারায়ণের কাকা নাজিরদেও শান্তনারায়ণের নামে ইজারাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৭৭৩ সালের পরবর্তী পর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই তিনটি চাকলা নিজ অধীনে নিয়ে রাজস্ব নির্ধারণ বা 'হস্ত-ও-বুদ' করবার সময় মহারাজার নিকট আত্মীয় অর্থাৎ চাকলা তিনটির তদারককারী নাজরিদেও-এর আত্মীয়-পরিজনদের গ্রাম বা ভূখণ্ডগুলিকে ছাড় দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই সকল ভূ-ভাগগুলির উপর কোচবিহার মহারাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির এই রাজস্ব ছাড় বা করমুক্ত এলাকাগুলি ইংরেজ শাসনাধীন বঙ্গ প্রদেশে কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। যার স্থানীয় নাম ছিল 'রাজওয়ারা'। আর এই সকল ভূ-খণ্ডে যারা বসবাস করত তারা আখ্যায়িত হতেন রাজগীর হিসেবে।

তাই ধরে নেওয়া যায় উক্ত জয়গোবিন্দ রায় হয়তবা একদিন রাজগীর হিসেবেই পরিচয় বহন করতেন। যাই হোক জয়গোবিন্দ রায়ের দুই পুত্র যথাক্রমে ডিসেম্বর রায় ও চন্দ্রমোহন রায়ের নামে নয় শত বিঘা জমি ছিল এই দুই ছিটমহলে। ১৯৯৩ সালে অর্থাৎ তিন বিঘা করিডর উন্মোচনের পরবর্তী বছরে বাংলাদেশি ভূমি দস্যুরা নিরবিচ্ছিন্ন অত্যাচার শুরু করে এই পরিবারের উপর। তাদের মূল লক্ষ্য এই বিপুল ভূ-সম্পত্তির দখল নেওয়া। পরিস্থিতি চরমে ওঠে যখন বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ১৯৯৩ সালে শরৎচন্দ্র রায়ের কাকা অর্থাৎ চন্দ্রমোহন রায়ের পুত্র মহেন্দ্রনাথ রায়কে রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুষ্কৃতীরা মহেন্দ্র রায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ ভারতীয় সীমানার ভেতরে ওকড়াবাড়ি-দেখাতায় ফেলে রেখে যায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় আতঙ্কিত ডিসেম্বর রায় ও চন্দ্রমোহন রায়ের পৌত্ররা ও তাঁদের পরিবার প্রাণ বাঁচাতে যে দিকে পারে ছুটে পালায়। ডিসেম্বর রায়ের পুত্র রজনীকান্ত রায়ের ভূ-খণ্ডে আশ্রয় নেয়। তবে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র সুবোধ রায় ও বুধেশ্বর রায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। বর্তমানে তারা নাজিরগঞ্জ ছিটমহলে বসবাস করছেন। তাদের বিপুল পরিমাণ জমি আজ বেদখল। শরৎবাবুর বর্তমান ঠিকানা এখন ডুয়ার্সের ধূপগুড়ি।

শুধু কি নাজিরগঞ্জ, খুঁজলে এরকম উদাহরণ বহু ভারতীয় ছিটখণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ৭৮ নং গরাডিশাল ছিটমহল।

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অধীনস্থ মোট ৬টি ছিটমহলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যার সব কয়টির নাম-ই গরাতি, তবে ছিট নম্বরগুলি আলাদা। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা তথা পঞ্চগড় থানার অভ্যন্তরে অবস্থিত যথাক্রমে ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ ও ৮০ ক্রমিক নম্বরে উল্লিখিত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮.২৩, ০.৭৯, ১৮.০০, ৯৫৮.৬৬, ১.৭৪ এবং ৭৩.৭৫ একর। এর মধ্যে ৭৮ নং গরাতি ছিটমহল সবথেকে বড়, যার জমির পরিমাণ ৯৫৮.৬৬ একর অর্থাৎ প্রায় ২ হাজার ৯ শত বিঘা। এই ছিটমহল সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী কথা শুনিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমার দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জনৈক ইসমাইল মিঞা।

সেটা গত শতকের চল্লিশের দশকের কথা। ৭৮ নং গরাতি ছিটমহল বা সাবেক রাজোয়ারার জোতদার ছিলেন বিজয় সিংহ ও উদয়শঙ্কর সিংহ। দ্বিজাতি তত্ত্বে দেশভাগ, দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের ইচ্ছানুযায়ী—কোচবিহার রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পটভূমিতে উক্ত ৭৮ নং গরাতিশাল ছিটমহলের জোতদার সিংহ পরিবার জনৈক ঘুরো মিঞাকে তাদের ১২ শত বিঘা জমি বিক্রয় করেন। ঘুরো মিঞার ভাই ধরগোস মিঞাও দুই শত বিঘা জমি ক্রয় করে উক্ত ছিটমহলে বসবাস করতে থাকেন। ঘুরো মিঞা ও ধরগোস মিঞারা হচ্ছেন রাজবংশী মুসলমান অর্থাৎ নস্যশেখ। গরাতিশালেই তাদের বাস। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান ঘেরা এই ছিটমহলে তারা বসবাস করলেও সীমান্ত উন্মুক্ত রক্ষা করতে কোনও অসুবিধা হত না। এছাড়াও তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রেল যোগাযোগ বজায় ছিল। সীমান্তে এত কড়াকড়ি ছিল না। ছিটবাসীরা অনায়াসেই হলদিবাড়িতে এসে জমি কেনা-বেচা বিষয়ক রেজিস্ট্রি করতে পারতেন। তারা সাংসারিক রসদ হলদিবাড়ি থেকে সংগ্রহ করতেন। এভাবেই চলছিল তাদের জীবনযাপনের প্রতিটি পর্ব। এদের পরিচয় ছিটবাসী ভারতীয়।

১৯৫৮ সাল, স্বাক্ষরিত হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থলসীমা চুক্তি। নেহরু-নুন চুক্তি নামে খ্যাত এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথ সচিব এম কে দেশাই এবং পাকিস্তানের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব এম এস এ বেগ। নেহরু-নুন চুক্তির অন্যতম বিষয় হল ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কিত অধ্যায়। এই পর্ব আলোচনায় সেটা বলা প্রয়োজন, ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ কর্তৃক বঙ্গ বিভাজনের সময় জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা যথাক্রমে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ, বোদা ও পাটগ্রাম থানাকে জলপাইগুড়ি থেকে বিযুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। বেঙ্গল বাউন্ডারি-কমিশন এই সময় জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা নির্ধারণ পর্বে একটি থানাকে অনুল্লেখ রেখে দেন, তা হল বোদা থানা। এর ফলে জলপাইগুড়ি সদর থানার ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতকে দেওয়া সত্ত্বেও র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক সীমানা রেখার বর্ণনায় বোদা থানার অনুল্লেখ হেতু পাকিস্তান বেরুবাড়ি ইউনিটের অংশ বিশেষ দাবি করতে থাকে। পাকিস্তানের এই অন্যায্য দাবিকে তদানীন্তনকালে পত্রপাঠ খারিজ না করে১৯৫৮ সালের সীমান্ত চুক্তির ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে এর অর্ধেক অংশ পাকিস্তান এবং ভারত সংলগ্ন অর্ধেক অংশ ভারত পাবে। এছাড়াও কোচবিহার জেলার ৪টি ছিটমহল যেগুলি দক্ষিণ বেরুবাড়ির মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ সবকাতি, বিন্নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি ১ম খণ্ড ও দেখাতা ওকড়াবাড়ি ছিটমহল পাকিস্তান পাবে। এই চারটি ছিটমহলের মোট আয়তন ৬.৮৪ বর্গ কিমি। এর পাশাপাশি ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের মোট আয়তন ২২.৫৮ বর্গ কিমি। এর অর্ধাংশ অর্থাৎ ১১.১৯ বর্গ কিমি এবং পূর্ব উল্লিখিত চারটি ছিটমহলের ৬.৮৪ বর্গ কিমি ধরে মোট ১৮.১৩ বর্গ কিমি পাকিস্তানকে দেবার প্রস্তাব ছিল '৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তিতে। এর পাশাপাশি এই চুক্তির ১০ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বতন কোচবিহার রাজ্যের যে সমস্ত ছিটমহল পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রয়েছে এবং ভারতের অভ্যন্তরে অর্থাৎ কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে যে সমস্ত পাকিস্তানি ছিটমহল রয়েছে সেগুলির সম্পূর্ণ বিনিময় হবে। অর্থাৎ মোট ১৩০টি ভারতীয় ছিটের ৪টি ব্যতিরেকে ১২৬টি ছিটমহলের ৩১ বর্গমাইল আয়তনের ভূ-খণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের ৯৫টি ছিটমহলের কম-বেশি ১৯ বর্গমাইল আয়তনের ভূ-খণ্ডের বিনিময় হবে। এর ফলে পাকিস্তান যে ১২ বর্গমাইল অতিরিক্ত ভূ-খণ্ড লাভ করবে তার জন্য ভারত কোনওপ্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না।

ব্যাস, গর্জে উঠল বেরুবাড়ি। দিকে দিকে আওয়াজ উঠল 'রক্ত দেব প্রাণ দেব, বেরুবাড়ি দেব না'। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব বিধায়ক বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। ১৯৫৮ সালের ২০ ডিসেম্বর হরতাল পালিত হল। বিধায়কদের কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, 'কী অধিকার আছে নেহরু বা নুনের যে ভারতবর্ষের কোনও নাগরিককে বলে যে তুমি কাল থেকে পাকিস্তানের নাগরিক হবে।' এরই মধ্যে মেখলিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি বিধানসভায় বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরোধিতা করে প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এর পাশাপাশি ওই বছরের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সূচনা হয়। অন্যদিকে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অর্থাৎ সর্বত্র এক টালমাটাল পরিস্থিতি। বেরুবাড়ির ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে গেল ছিটমহলের কথা। সেই সময়কালে একজনও প্রশ্ন তুললেন না যে, পূর্ব ভারতের হিন্দু রাজ্য বলে পরিচিত ইংরেজ আশ্রিত করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশেসন (Instrument of Accession) স্বাক্ষর করে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর তাঁর রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে দেন। ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশেসন বা সংযুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই স্থিতাবস্থা চুক্তি বা স্ট্যান্ড স্টিল এগ্রিমেন্ট (Stand Still Agreement)-এ স্বাক্ষর করে রাজ্যের তৎকালীন প্রশাসনিক স্থিতাবস্থার উপরই মোহর অঙ্কিত করেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিম্মৎ সিং কে মাহেশ্বরী। অথচ ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ডগুলিকে কেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হবে? বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরোধিতা করা হল অথচ ছিটমহলগুলি উপেক্ষিত থেকে গেল। যদিও বলা প্রয়োজন ছিল কোচবিহার রাজ্যের ভারত ভুক্তি অনুসারে সাবেক কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহলগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলি হস্তান্তর করা চলবে না। এই ছিট ভূ-খণ্ডগুলির পিছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস। প্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস কখনই ছিটমহল বাদ দিয়ে নয়। এই এলাকাগুলি কোচবিহারের মহারাজার বকলমে নাজিরদেও-এর শাসনাধীন এলাকা। নাজিরগঞ্জ নামাঙ্কিত ১৮টি ছিটমহল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তির মধ্যে দিয়ে ছিটমহল বিনিময়ের ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে গেল ইতিহাসের ফিসফিসানি। কেউ একবারও শুনতে চেষ্টা করলেন না যে ইতিহাস ফিস ফিস করে কী বলতে চাইছে? হয়ত এটা কালের নিয়ম। আর এই কালের নিয়ম বা সময়ের দাবি মেনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ছিটমহলগুলির উপর। তাদের ষড়যন্ত্রেই নাজিরগঞ্জের পথ ধরে ৭৮ গরাতিশাল হয়ে উঠল আরেকটি বধ্যভূমি।

(পরবর্তী সংখ্যায়)

দেবব্রত চাকী

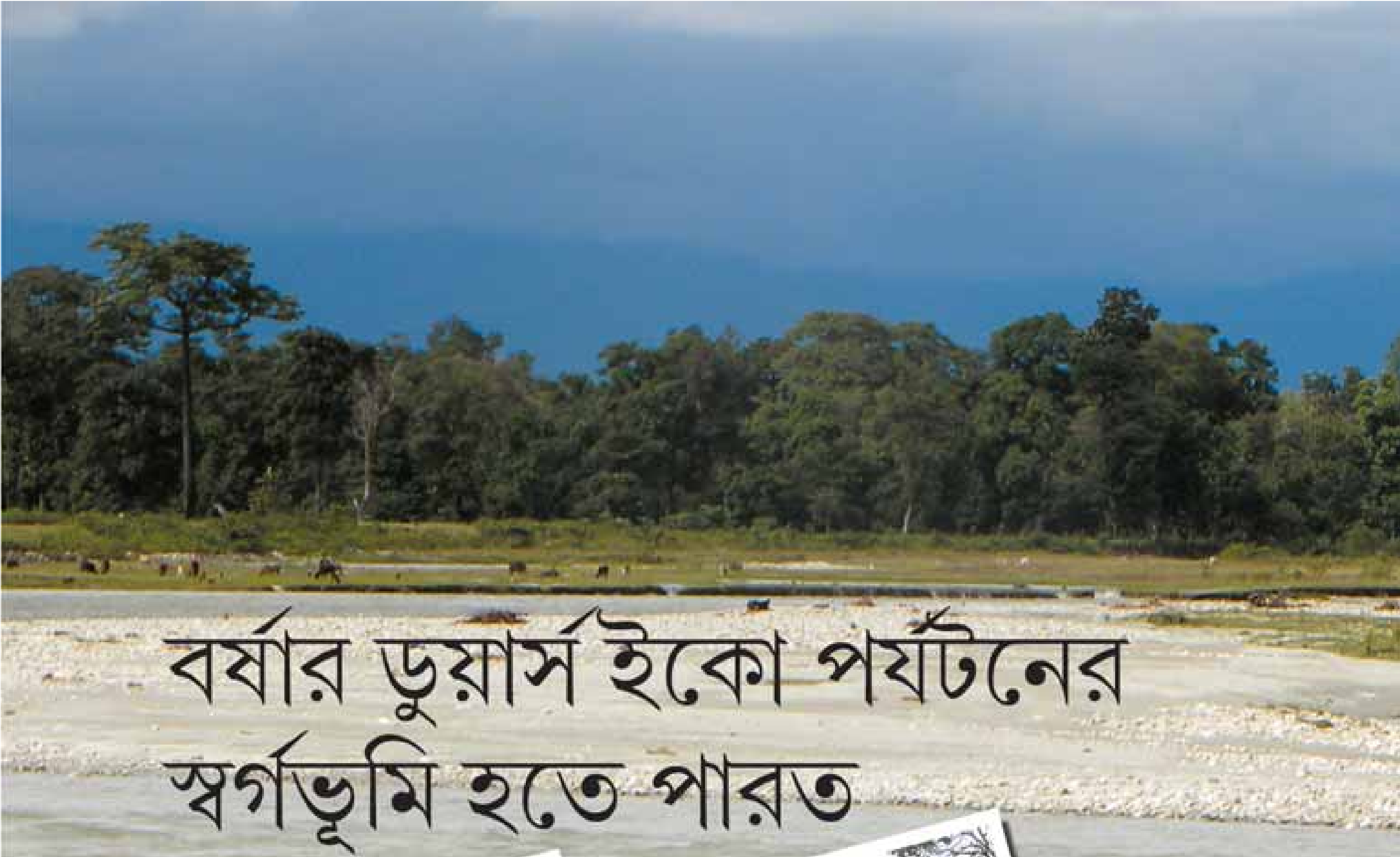

বর্ষার ডুয়ার্স ইকো পর্যটনের স্বর্গভূমি হতে পারত

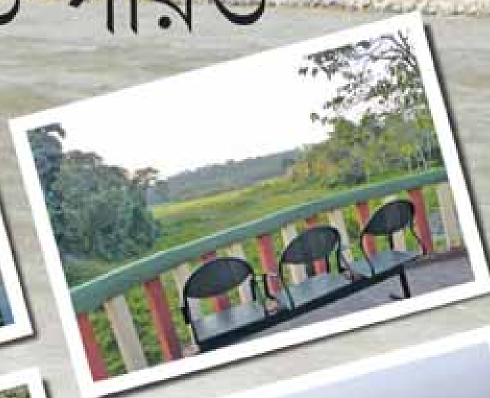

ডুয়ার্সে যাঁরা পুজোয় বা বড়দিনে বেড়াতে যান তাঁরা নিশ্চিতরূপে ভীষণ আফশোস করতেন একবার বর্ষার ডুয়ার্স দেখলে। এ রূপ একবার দেখলে যে কোনও প্রকৃতি প্রেমিকেরই মনে শ্লাঘা জন্মাবে—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সবুজের এত রকমভেদ বোধহয় আর কোথাও মিলবে না, শীর্ণকায়া পাথুরে নদীগুলিতে ঢেউ তোলা ভরা জলে ঘোলা আকাশের ছায়ায়, দূরে পাহাড় বনের প্রান্তরে জটলা করে আছে কালো মেঘ—সকাল নেই দুপুর নেই রাত্রি নেই ভাসিয়ে দেয় প্রান্তর। মাঝে মাঝে বিকেলের মেঘফুঁড়ে দেখা দেয় সোনা রোদ্দুর— পিচঢালা কালো মসৃণ পথ বেয়ে গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয়—বড় মিষ্টি লাগে আর ভাবি, এ তো আমারই সোনার ডুয়ার্স। বৃষ্টি স্নিগ্ধ সকালে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল দেখতে কিংবা কালো মেঘে ঢাকা চা-বাগানের রহস্যময়ী সৌন্দর্য দেখতে আসতেই হবে এই ডুয়ার্সে। যারা বর্ষায় ভিজতে ভালোবাসে তাদের জন্য ছুটির কয়েকটা দিন এসময় ডুয়ার্সে তুলনাহীন। অথচ আজ পর্যন্ত আমরা দেখলাম না আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তরকে এ নিয়ে কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করতে। প্রশ্ন করতেই তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করবেন, কেন বর্ষায় তো জঙ্গল বন্ধ থাকে, কে আসবে তখন? বলতে বাধ্য হতে হয়, সেইসব কর্তাব্যক্তিদের বর্ষার ডুয়ার্স সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

অথচ এসময়টাতেই রিসর্টে ঘরভাড়া কিংবা প্যাকেজে ‘মনসুন ধামাকা’ নামে ব্যাপক

হারে ছাড় দিয়ে পর্যটক টানার চেষ্টা কি করা যায় না? গতবছর যখন এনসেফালাইটিস নিয়ে মিডিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারে পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হল তখন পর্যটন দপ্তরের 'মনসুন ডুয়ার্স প্যাকেজ' ঘোষণা ও প্রচার সেই ক্ষতে মলম লাগাতে পারত অনেকটাই। আর সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া বর্ষার ডুয়ার্সকে জনপ্রিয় করার কোনও প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না সেকথাও সত্য। সেই প্রচেষ্টা সফল হতে শুরু করলে তবে না প্রাইভেট লজগুলি তা অনুকরণ করতে শুরু করবে। আর প্রথম মরশুমের পাইলট প্রজেক্টেই যে সাফল্য আসবে তার কোনও মানে নেই, বরং সৃষ্টি হতে পারে নতুন সম্ভাবনার। ভাবুন তো একবার মূর্তি নদীর ধারে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের রিসর্টটিতে বসে আছেন ঘোর বর্ষার উইকএন্ডে! সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, নদী, জঙ্গল, পাহাড় এবং আকাশ! পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন অর্ধেক খরচে, পুজোর ছুটির ভীড় এড়িয়ে ক'টা দিন কাছের মানুষগুলির সঙ্গে রাউন্ড দ্য ক্লক কাটানোও তো বিরল ঘটনা!

বহু মানুষ হয়তো জানেন কিংবা জানেন না বর্ষায় গরুমারায় খোলা থাকে বন্যপ্রাণ দপ্তরের সবক'টি ইকো লজ। রোজকার দু'জনের খরচ ৩,৯০০ টাকা, তিনজনের ৫,২০০ টাকা। থাকা,

বর্ষায় ডুয়ার্স বেড়াতে চাইলে বুকিং করুন ০৩৩৬৫৩৬০৪৬৩।

খাওয়া, ওয়াচ টাওয়ার, হাতির পিঠে সাফারি এবং সন্ধ্যায় আদিবাসী নাচ সহ। বন-কটেজে না থাকলেও চলবে। মেদলা ওয়াচ টাওয়ার এ সময় খোলা থাকে। মাথাপিছু খরচ ১২০ টাকা, গরুর গাড়িতে মাথা পিছু ৩৫ টাকা আর গাইড প্রতি দশজনে ১৫০ টাকা।

গরুমারা ছাড়াও বর্ষায় ছুটি কাটাবার অনবদ্য জায়গা মূর্তি, মৌচুকি, প্যারেন আর চিলাপাতা। মূর্তিতে আছে সরকারি বেসরকারি লজ, মৌচুকিতে বন্যপ্রাণ শাখার ইকোলজ, প্যারেনে বন উন্নয়ন নিগমের নেচার রিসর্ট ছাড়াও আছে বেসরকারি কটেজ।

উত্তরায়ণ সমাজদার

ছবি: প্রদীপ্ত চক্রবর্তী, পূষণ দেব মল্লিক, তাপস দাস আইএফএস

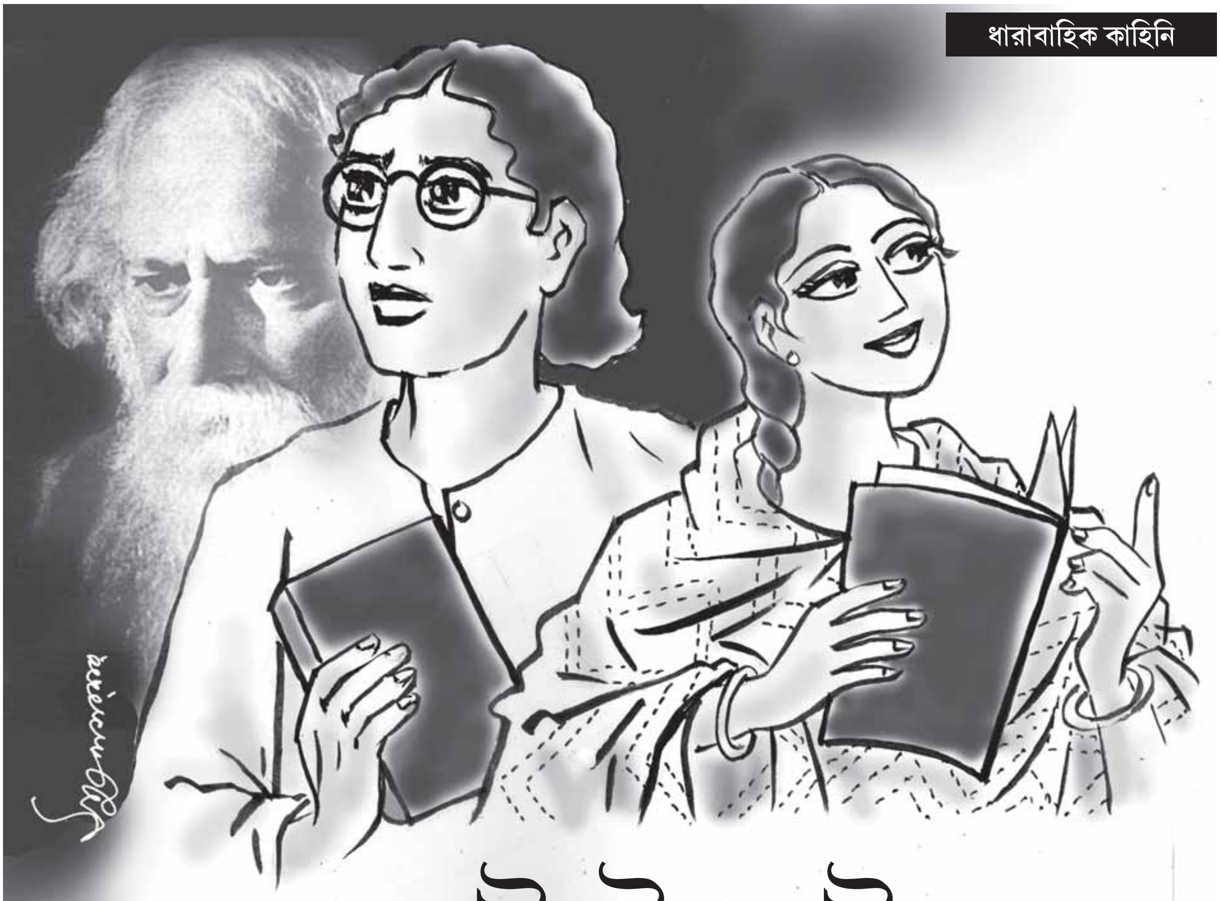

তরাই উৎরাই

৮

১৯২৮ সালের দোসরা এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত বেশ গরম থাকলেও বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ কালবৈশাখীর একটা ধাক্কা সন্ধের আগেই শহরটাকে করে তুলল মনোরম। উপেন একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে সাইকেল নিয়ে বের হল। স্টেশনের পুব দিকে লাইন পেরিয়ে যে পাড়াটি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে, সেই নয়াবসতি হল উপেনের বর্তমান আস্তানা। তাঁর বাড়ি কলকাতায়, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে কুড়ি মিনিট দূরে। বাবা গোপিকামোহন সান্যাল প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল ছাত্র এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর বাড়িতে সব কিছুই বিলিতি কায়দায় চলে। আইএসসি-তে ভর্তি হওয়া অবধি উপেন নিজেও ছিল আধা ইংরেজ। গোপিকাবাবু যখন ছেলেকে লন্ডনে পাঠাবার এবং তাঁর আগে কৃষ্ণনগরের দেবেন্দ্র চক্রবর্তীর সেজো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় মশগুল, তখন উপেন ধুতি আর ফতুয়া পরা শুরু করল। গোলমেলে যুবকদের সঙ্গে শুরু করল মেলামেশা। বিচক্ষণ গোপিকা সান্যাল লোক লাগিয়ে জেনে গেলেন ছেলে বিপ্লবীদের সঙ্গে ওঠা-বসা শুরু করেছে। তিনি আর দেরি না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন শালার কাছে, জলপাইগুড়িতে। তিনি ছিলেন আইনজীবী।

কলকাতার উত্তেজনা ছেড়ে জলপাইগুড়িতে মামার কাছে এসে উপেন কয়েকদিন ঝিম মেরে পড়েছিল। মামা লোকটি অবশ্য হাসিখুশি। লেখাপড়া জানা লোক। বাড়িতে আলমারি ভর্তি রকমারি বই। কলকাতা থেকে কয়েকটা মাসিকপত্র নিয়মিত আসে। মামা অবশ্য সাহিত্যের কিছুই পড়েন না। তাঁর প্রিয় বিষয় হল বিশ্বের আশ্চর্য সংবাদ, মহাকাশের কাহিনি আর ভ্রমণ। উপেনের দুই মামাতো বোন লেখাপড়া জানে। ছোটটি এখন চারদিকে ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে স্কুলে যাচ্ছে। বড়ো বোনের বয়স বারো পেরিয়ে যাওয়ায় স্কুল যাওয়া ছেড়ে বাড়িতেই পড়ছে এখন। সে বাংলা উপন্যাস বিষয়ে ছোটখাট বিশেষজ্ঞ। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ, নগেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ—এঁদের লেখা উপন্যাস তাঁর বাড়িতেই আছে। নেই কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই। এর কারণ উপেনের মামা রবীন্দ্রনাথকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। উপেন এখানে আসার পর পর পড়শি রবি বকশির বাড়িতে তাঁর এক গায়ক আত্মীয় এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তিনি একদিন গান গেয়ে রবিবাবুর বন্ধুদের শুনিয়েছিলেন। সে আসরে উপেনের মামাও গিয়েছিলেন আগ্রহ নিয়ে। এমনিতে মামার গানের গলাটা মন্দ নয়। মাঝে মাঝেই টপ্পার দানা লাগানো শ্যামা সংগীত কিংবা ভারি চালের কীর্তনের পদ গেয়ে থাকেন। যদিও গানগুলি তিন-চার লাইনের বেশি তিনি গাইতে পারেন না। কিন্তু ওইটুকুতেই বোঝা যায় যে গান ব্যাপারটা তিনি বোঝেন। রবিবাবুর আত্মীয় প্রথমে বেহাগ তারপর তিন-চারটি ঠুংরি আর টপ্পা গাইবার পর বাড়ির কর্ত্রী অনুরোধ করলেন আধুনিক গানের জন্য। আত্মীয় তখন গেয়ে শুনিয়েছিল রবি ঠাকুরের আধুনিক গান—'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'। গান শুনে মামা বেজায় খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন, 'যত সব ট্র্যাশ! তরী হঠাৎ ডুবে যাবে মানে? জল নেই ঝড় নেই—আচমকা ডুবে গেল, অ্যাঁ? ফুটো ছিল নাকি?'

মামার বড়ো মেয়ে শোভাময়ী এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখা তেমন পড়ে উঠতে পারেনি। বাবাকে লুকিয়ে একটা উপন্যাসের অর্ধেকটা পড়েছিল। তার নাম 'নৌকাডুবি'। এছাড়া কয়েকটা কবিতা পড়েছিল একটা বইতে। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবি, এটা জানার পরেও বাবা রবি ঠাকুরকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবুর আমলে নোবেল প্রাইজ চালু থাকলে তিনিই পেতেন।'

উপেন আসায় অবশ্য শোভার একটু সুবিধে হয়েছে। উপেনও তাঁর মামার মতো সাহিত্যপাঠে বিমুখ। সে কেবল রাজনীতির খবর জানে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। সে শোভাকে আশ্বাস দিয়েছে রবি ঠাকুরের উপন্যাস জোগাড় করে দেওয়ার। কলকাতা থেকে আসার পর সে যখন ঝিমুনি কাটিয়ে আবার তৎপর হয়েছিল, তখন বুঝতে পেরেছিল জলপাইগুড়িতে এসে তাঁর খুব একটা ক্ষতি হয়নি। এখানেও বিপ্লবী চিন্তাধারার ছেলেরা আছে আর তাঁদের প্রতি তাঁর মামা খুব একটা বিমুখ নয়। তিনি গান্ধিজীর ভক্ত হলেও বিপ্লবীদের শরীর চর্চা বোমা তৈরির উত্তেজনা, গুপ্ত বৈঠক—এসব বেশ উপভোগ করেন। শহরের যুবকরা তাঁকে খুদিদা ডাকে। ভালো নাম একটা থাকলেও শহরে তিনি খুদিবাবু কিংবা খুদিদা নামেই পরিচিত। পুজোর পর এই শহরে এসে এখনও অবধি উপেন তাঁর বয়সি কোনও ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি। শুধু বঙ্কিম নামের একটি তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাসখানেক হল। মামার সাইকেল নিয়ে দোলের আগে আগে সন্ধ্যাবেলায় শহর চক্কর দিয়ে ফেরার সময় উপেন একটা কুকুরের গায়ে চাকা তুলে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সেই তরুণ দৌড়ে এসে সাইকেল সরিয়ে উপেনকে দাঁড় করিয়ে ব্যাগ্রভাবে বলেছিল, 'তোমার লাগেনি তো ভাই?' সেই থেকে বঙ্কিম রায়ের সঙ্গে আলাপ। বয়সে সে খানিকটা বড়ো হলেও তাঁর সঙ্গে উপেনের বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। ক'দিন হল বিকেলের পর দু'জন গল্প করতে করতে দিনবাজারের পুল পেরিয়ে রায়কত পাড়ার ভেতর দিয়ে তিস্তা নদী পর্যন্ত চলে যায়। শহর জলপাইগুড়িকে উপেন একটু একটু করে জানতে শুরু করেছে বঙ্কিমের চোখ দিয়ে। অবশ্য বঙ্কিমের বদলে 'হিদারু' নামেই সে বেশি পরিচিত।

উপেন গায়ে চাদর জড়িয়ে যাচ্ছিল কদমতলার দিকে। শহরটায় পাকা আর বড়ো বাড়ি ঘর খুব একটা নেই। বেশিরভাগই টিনের খড়ের চাল ছাউনি দেওয়া কাঠের বাড়ি। এর মধ্যে যে বাড়িগুলোর দেয়াল পাকা বলে মনে হচ্ছে, তা আসলে বাঁশের ওপর সিমেন্টের প্রলেপ লাগানো। উপেনের মনে হয়েছিল যে এখানে কলকাতার কিছুই সে পাবে না। আস্তে আস্তে বুঝেছে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। মামার মতে বড়ো জোর হাজার পঁচিশ লোক থাকে শহরে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে লোকজনের বেশ উৎসাহ। জেলা স্কুল বাদ দিলেও বেসরকারি স্কুলের অভাব নেই। উপেন যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল তার দু'পাশে বেশ কয়েকটা ব্যাঙ্ক। উত্তর থেকে দক্ষিণে থানার দিকে চলে যাওয়া এই ছোট্ট রাস্তাটিকে শহরের লোকেরা ডাকে 'ক্লাইভ স্ট্রিট' বলে। লাল ইটের পর কয়েকটা দোতলা বাড়ির একটা হল আর্য ব্যাঙ্কের ভবন। উপেন সেই রাস্তায় একটা চক্কর কেটে যাচ্ছিল কদমতলার দিকে। শোভার জন্য রবীন্দ্রনাথের বই কিনতে হবে।

উপেন লক্ষ করেছে শহরের খুব কম বাড়িই বেড়া বা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যেতে শর্টকাট হিসেবে এর ওর বাড়ির উঠোন ব্যবহার করাটাই অলিখিত নিয়ম। কেউ কিছু মনে করে না। গোড়াতে উপেনের অস্বস্তি হত, এখন সে খানিকটা রপ্ত হয়েছে। আরেকটা জিনিসও সে রপ্ত করছে বঙ্কিমের কাছ থেকে। সেটা হল দেশি ভাষা। এই ভূখণ্ডের আদি মানুষেরা প্রায় সকলেই রাজবংশী। এঁদের ভাষা উপেনের কাছে গোড়াতে দুর্বোধ্য মনে হত। কলকাতার আশপাশে গা-গঞ্জের ভাষার সঙ্গে কোনও মিল নেই তাঁদের ভাষার। অথচ মামা এমনকি শোভাও দিব্যি বলতে পারে এই ভাষা। জলপাইগুড়ি শহর গড়ে ওঠার পর নানা প্রান্ত থেকে ভাগ্যান্বেষী মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে এখানে। রাজবংশীদের কাছে এরা সবাই ভাটিয়া বা ভাটি দেশের লোক।

কদমতলায় আসতে আসতে অন্ধকার নেমে এল। বই-এর দোকানদার পেট্রোম্যাক্সের আলোটা জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি ছেলে একটু ঝুঁকে সেই চেষ্টার দিকে তাকিয়েছিল। উপেন ছেলেটাকে চিনতে পারল। কয়েকদিন আগে বঙ্কিমের সঙ্গে ঘটকবাড়ির পেছন দিকে বেগুনটারির দিকে শর্টকাটে হাঁটার সময় এই ছেলেটা বঙ্কিমকে দাঁড় করিয়ে কী জানি আলোচনা করেছিল। উপেন পরে জেনেছিল ছেলেটার নাম মহেন্দ্র।

চোখাচোখি হতেই মহেন্দ্র হাসল। তারপর বলল, 'আপনি তো উপেন্দ্রনাথ তাই না? খুদিদার ভাগনে?'

উপেন হাসিমুখে বলল, 'আপনার নাম আমি জানি।'

—হিদারু বলেছে তো? উনি গান্ধিজীর ভক্ত। ওনাকে আমরাও শ্রদ্ধা করি কিন্তু উনি এবং ওনার কংগ্রেস তো আসলে মডারেট, তাই না?

উপেনের মনের মধ্যে অনেকদিন সুপ্ত থাকা বিদ্যুৎটা চমকে উঠল। সে তাকিয়ে থাকল মহেন্দ্রর দিকে। পেট্রোম্যাক্স জ্বলে উঠেছে। পাম্প দিয়ে তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে যাচ্ছে দোকানদার। চারদিক আলোয় ঝলমল করে উঠছে। সেই উজ্জ্বল আলোয় পরস্পরের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মহেন্দ্র আর উপেন। শেষে মহেন্দ্র দু-পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমরা স্টাডি করেছি। কী বই নেবেন?'

—রবিবাবুর উপন্যাস। উপেন স্বাভাবিক হয়ে জানাল। যেই আলোচনার ইঙ্গিত একটু আগে তাঁর মনে ঘুমানো বিদ্যুৎকে জাগিয়ে তুলেছিল সে আলোচনার স্থান যে এটা নয় তা অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝে নিয়েছিল সে।

—কিন্তু খুদিদা আর রবিবাবু তো আদা আর কাঁচকলা! লঘু স্বরে বলল মহেন্দ্র। তাঁর বলার ভঙ্গি দোকানদারকেও হাসিয়ে দিয়েছে। তিনি আলোটা ঝুলিয়ে দিয়ে দোকানের ভেতর প্রবেশ করতে করতে বললেন, 'উনি ফি মাসে বই কম কেনেন না। কিন্তু রবিবাবু দেখলেই সরিয়ে দেবেন। তবে এটা ঠিক যে শরৎবাবু হলেন লক্ষ্মী। রবিবাবু প্রাইজ পেলেও সেল কিন্তু তেমন নেই। তা কী নভেল নেবেন রবিবাবুর? পাঁচ-ছ'টার বেশি কিন্তু হবে না।'

আজ সকালেই বাবার পাঠানো তিরিশ টাকা এসে পৌঁছেছে হাতে। উপেন বই কিনল পাঁচ টাকা চার আনার 'বলাকা' নামের একটা কবিতার বইও কিনল সে। তারপর মহেন্দ্রর সঙ্গে একটু এগিয়ে, কদমতলা মোড়ের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টো গরুর গাড়ির পেছনে প্রায় অন্ধকার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ডুবে গেল সেই নিষিদ্ধ আলোচনায়। আটটার সময় চার টাকা খরচ করে চা কিনল এক পাউন্ড। মামা তাঁর চায়ের ভক্ত। উপেন আগে না খেলেও এখন পড়েছে এই নেশায়।

নতুন চা পেয়ে মামা এতটাই আমোদ পেলেন যে মেয়ের জন্য ভাগনের আনা বইগুলোর দিকে চেয়েও দেখলেন না। রাতের খাওয়া শেষ করে বাবা চারটে বাড়ি পড়ে কীর্তন শুনতে বেরিয়ে গেলে শোভা উপন্যাস ছেড়ে আগে বলাকা নামক বইটার পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর একটা জায়গায় থমকে গিয়ে পড়তে লাগল মন দিয়ে। বাইরে তখন বিদ্যুতালোকহীন রাতকে ঈষৎ তরল করে দিয়েছে চাঁদের হলদেটে আলো। হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে। বাতাসে শীত শীত ভাব। পাতলা কাঁথাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে শোভা আবার পড়ল লাইনগুলো। এই নিয়ে পাঁচ বার। বাইরের বসন্ত প্রকৃতির কয়েকটা গুঁড়ো ঢুকে পড়ল তাঁর অবচেতনে। অদ্ভুত রোমাঞ্চে শির শির করে উঠল শোভার শরীর। এমন পঙক্তি আগে সে পড়েনি। আরও কয়েকবার পড়ার পর এক সময় সে অস্ফুটে আবৃত্তি করতে লাগল, 'তুমি কি কেবলই ছবি? শুধু পটে লিখা?'

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কন: সুবল সরকার

যাঁর কারিগরি উদ্ভাবন নিয়ে এল গয়নার দুনিয়ায় আলোড়ন

শিল্পী মন নিয়ে শিল্প ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে ক্ষুদ্র চারাগাছ আজ মহিরুহতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শুধু অর্থনীতির বিস্তারই নয়, এই প্রান্ত জেলার রমণীদের মধ্যে বাসনার জন্ম দেওয়া গিয়েছে। সোনা নয়, একেবারে সোনার মতো অলংকার। রাভা ঐতিহ্যের

কোচবিহার অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ট পিছিয়ে। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না সর্বদাই খাঁটি সোনা কেনার। তবে কি রূপবতী হবে না অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পরা ঘরের বধূ ও কন্যারা? এই অবস্থায় মাথায় এল নতুন রকমের গহনা প্রস্তুতের। স্বর্ণ শিল্পের কারিগরী বিদ্যা তাঁর ছিলই। তার উপর শিক্ষিত বেকার যুবক বিশ্বজিৎ পোদ্দার একজন কারিগর নিয়ে শুরু করলেন সোনার বিকল্প মাইক্রো গোল্ড তৈরি ও তার ব্যবসা।

কোচবিহারে শুরু হওয়া বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড আজ সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম মাইক্রোগোল্ড প্রতিষ্ঠাতা এই গহনা তৈরিতে প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য নমিনেশন পেয়েছে। এই বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ডের গহনা কোয়ালিটির জন্য আইএসও ৯০০১-২০০৮ সার্টিফাই-এ অনুমোদন পেয়েছে। পিওর তামার মধ্যে সোনার ডিজাইনকে অনুকরণ করে উন্নত প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে ২৩ ক্যারেট গোল্ড প্লেটেড করে তৈরি করা হচ্ছে চুড়, বালা, ব্রেসলেট, আয়স্তি, কনকোন, নেকলেস, চেইন, চুড়ি, কানের দুল, ঝুমকা সমস্ত ধরনের কুন্দন সেট, পিওর এ.ডি. লকেট, নেকলেস সেট, পিওর মুক্তার গহনা প্রভৃতি।

বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড কোচবিহার থেকে যাত্রা শুরু করলেও এই প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটেছে গোটা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে (লাল দিঘির উত্তর পাশে) মেগা শো-রুম ছাড়াও কলকাতার পার্ক সার্কাস, বিরাটি, হাওড়া-সহ অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট-বড় শো-রুম। উত্তর-পূর্ব ভারতের গহনার এক নাম বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড একদিনে এই বাজার দখল করেনি। তাদের নির্মিত গহনা মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটায়। মহিলাদের সজ্জার উপকরণ যে সোনাই হতে হবে এই ধারণাকেও ভেঙে ফেলা গিয়েছে। প্রতিদিন ২০ থেকে ২১ ঘণ্টা দিনরাত পরিশ্রম করে বিশ্বজিৎ পোদ্দার তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলেছেন। এই পথে উৎসাহ জুগিয়ে যিনি পথকে মসৃণ করেছেন তিনি তাঁর স্ত্রী মৌমিতা পোদ্দার। তাই গ্রামের মেঠো পথ থেকে মহানগরের রাজপথ পর্যন্ত এই গহনাকে পৌঁছে দিতে সাধারণ ক্রেতা থেকে বিক্রেতাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বজিৎবাবু।

নিজস্ব প্রতিবেদন

B. PODDER
MICRO GOLD
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)
Mobile: 98320 92714, 8967863754

অবলুপ্তির পথে মাঝি জনজাতি

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেপালি সম্প্রদায়ভুক্ত মাঝি সম্প্রদায়ও রয়েছে। বিশেষ করে এই অঞ্চলের ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলে এদের বর্তমান বসবাস রয়েছে। গবেষকদের মতে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে নেপালের সপ্তকোশী নদী-সহ ইন্দ্রাবতী, সুনকোশী, তামাকোশী, দুধকোশী, লিখু, অরুণ, তমোর এছাড়া বাগমোতি, মকোয়নপুর, কাবরে, সিন্দুলি, মরিখোলা, কমলাসাই তথা উদয়পুরের ত্রিগুনা নদীর আশেপাশে মাঝিদের পুরনো বসবাস ছিল। এছাড়া পূর্ব ও মধ্য নেপালের সমতল (মদেশ) অঞ্চলেও এদের বসতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। মাঝি শব্দের বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা এখনও পাওয়া যায়নি। তবুও নেপালের একটি আলাদা আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবেই এদের পরিচয় রয়েছে।

নেপালি বৃহৎ শব্দকোষ অনুযায়ী (২০০৬ বিক্রম সংবাদ) দুই প্রকার শব্দের অর্থ দেখানো হয়েছে। প্রথমত, পূর্ব থেকেই তারা একটি কাঠের ডোঙায় (নৌকা) মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত। দ্বিতীয়ত, নেপালের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত বলে তারা মাঝি হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

বিশিষ্ট গবেষক ডোর বাহাদুর রিস্ট-এর মত অনুসারে পাহাড়ে যারা বসবাস করত তাদের বোটে মাঝি এবং সমতলে যারা বসবাস করত তাদের ‘কুসর’ নামে চিহ্নিত করা হত। এরা নেপালের সবচেয়ে পুরনো জনজাতি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন। মাঝিদের সম্পর্কে বিশেষ করে লিখিত সাহিত্যে কোনও উল্লেখ নেই। তার মধ্যে একমাত্র ধন বাহাদুর মাঝির লেখা—‘মাঝি জাতিকো সংস্কার ও সংস্কৃতি’ (২০০৬) নামে বইটিতে মাঝি জাতির লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী মাঝিদের সম্পর্কে এখনও তেমনভাবে আলোকপাত করা হয়নি। যতদূর জানা গিয়েছে, এই সম্প্রদায়ের মানুষদের এই অঞ্চলের বিভিন্ন নদী তীরবর্তী যেমন—তোর্ষা, রায়ডাক, সংকোশ, ডায়না অঞ্চলেই এদের বসবাস ছিল। নদীর ওপরই এরা নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু রাস্তাঘাট, নদীর ওপর সেতু নির্মাণের ফলে এরা বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন চা-বাগান অঞ্চলে চা-শ্রমিক হিসেবে বর্তমানে বসবাস করছে। তবে সংখ্যায় এরা এই অঞ্চলে এতই কম যে এই জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রায় অবলুপ্তির পথে যেতে বসেছে।

মাঝি জনগোষ্ঠীর মানুষেরও নির্দিষ্ট নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। নেপালের কিছু অঞ্চলে যথা রামেছাপা, কাবরে, ওখোলঢোঙ্গা, খোটাঙ্গ দোলাকা প্রভৃতি অঞ্চলে মাঝিদের ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এই ভাষা ভোর-পেলি ভাষা পরিবারের অন্তর্গত বলে গবেষকদের অনুমান। তবে অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বর্তমানে এই ভাষাও বিলুপ্তির পথে। উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে মাঝি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বর্তমান সময়ে নেপালি ভাষাতেই বেশি অভ্যস্ত। মাঝি জাতি হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থার ভিতর পড়ে না। কিন্তু কিছু কিছু মাঝিরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও মিল নেই। তান্ত্রিক এবং সমাজের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মাধ্যমেই এদের ক্রিয়া কর্ম হয়ে থাকে। এমনকি মৃত্যুর পরেও তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অন্য কোনও জাতির ছোঁয়াছুঁয়ি পছন্দ করে না।

মাঝিদের নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে পুরুষরা কচ্ছর, ভোটো, ফেটা, ইস্টকোট, টোপি ইত্যাদি পরিধান করেন। সোনার গহনা পরার রীতিও রয়েছে পুরুষদের মধ্যে। মাডবারি, বীরমলি এবং ছোটদের হাতে রুপোর চুরি ব্যবহারের প্রথা রয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে—ফড়িয়া, চৌবন্ধী-চোলো, পটুকা, লাছা ইত্যাদি পরিধান করেন। গহনার মধ্যে—কানে ঢুংরি, মাডবারি, চেপ্টে সুন, নাকে-ফুলি, বুলাকি, কপালে-শিরফুল, গলাতে হাসুলি, রুপোর সিকরি, হারিপোতে পন্দা, পায়ে-কল্লি, হাতে-চুরা, মাঘ, মুখে-চুরা, কাচের চুড়িও পরিধান করেন। বর্তমান সময়ে পোষাক এবং গহনাতে আধুনিকতার ছোঁয়া। মাংস ইত্যাদি বিশেষ পছন্দের খাবার। বাইরে থেকে আত্মীয় পরিজনেরা এলে তাদের আপ্যায়ন করা হয় জার দিয়ে।

মাঝি সম্প্রদায়ের গোত্র বা থর যথাক্রমে— (১) দনোয়ার মাঝি (২) কুসুয়া মাঝি (৩) কুমালে মাঝি (৪) বাতের মাঝি (৫) থালারা মাঝি ইত্যাদি। উপথর হল—(১) রাজবংশী দানোয়ার মাঝি (২) বোটে দানোয়ার মাঝি (৩) টোকপরে দানোয়ার মাঝি (৫) গোরে দানোয়ার মাঝি (৬) সূর্যবাসী দানোয়ার মাঝি ইত্যাদি।

গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের মৃতদেহ দেখা বারণ থাকে। দেখলে সন্তানের গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে যায় বলে এদের বিশ্বাস রয়েছে। বাঘ, ভালুক ইত্যাদি পশুর মাংস খাওয়া বারণ থাকে। কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি বিশেষ করে লাঙল ইত্যাদি ডিঙিয়ে যাওয়া নিষেধ থাকে। এতে প্রসব যন্ত্রণা বাড়ে বলে তাদের বিশ্বাস। গর্ভবতী মহিলা এবং তার স্বামীর কোনও জীব হত্যা করা বারণ। বিশেষ করে সাপ ইত্যাদি হত্যা করা বারণ। ঘরের ভিতরই প্রসব কার্যের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ মহিলারাই এই প্রসব কার্যে সহায়তা করেন। সন্তান প্রসবের পর ঘরের দরজায় ছেলে হলে মোরগ এবং মেয়ে হলে মুরগি কাটা হয়। এই দিন থেকেই মাংস, জার, রক্সি, ঘি, জোয়ান ইত্যাদি প্রসূতিকে খাওয়ানো হয়ে থাকে।

সন্তান জন্মের পর বিজোড় দিনে অর্থাৎ তিন, পাঁচ কিংবা সাত দিনে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তবে নাভি পড়ার পরেই নামকরণ হয়ে থাকে। শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানকে প্যাসনি বলা হয়। সাধারণত ছেলে হলে ছয় মাসে এবং মেয়ে হলে পাঁচ মাসে প্যাসনি হয়ে থাকে। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্করাই প্রথমে শিশুর মুখে ভাত তুলে দেন। আট মাস বয়সে শিশুর দাঁত উঠলে শিশুর মামার পক্ষে অশুভ হতে পারে তার জন্য শিশুর মুখ না দেখে মামা আড়াল থেকে শিশুকে বাটিতে করে দুধ খাইয়ে এবং কপালে চালের টিপ পরিয়ে কিছু

উপহার সামগ্রী দিয়ে মামা শিশুর মুখ দেখে থাকে—এটাই মাঝি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।

শিশুর প্রথম চুল কাটার প্রথাকে ছেওয়ার বলা হয়। শিশুর মামা-ই প্রথম চুল কেটে থাকে। যদি নিজস্ব মামা না থাকে তবে অন্য কাউকে মামা হিসেবে মেনে নিয়ে এই কাজ করানো হয়। গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গরুর রশি গলায় দিয়ে মামা শিশুর চুল কেটে পাতার টুকরিতে রাখে এবং পরবর্তীতে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কাছাকাছি নদী না থাকলে বট, পিপল গাছের নিচে রেখে দেয়।

মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত মাগি বিবাহ, চোরি বিবাহ, জারি বিবাহ, বিধবা বিবাহ, আন্তঃজাতি বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ প্রচলিত আছে। সাধারণত ছেলে-মেয়ে অভিভাবকেরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাহকে মাগি বিবাহ বলে। অভিভাবকের সম্মতি না নিয়ে ছেলে-মেয়ে নিজেরা পছন্দ করে বিবাহকে চোরি বিবাহ বলে। অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে বিবাহকে জারি বিবাহ বলা হয়। এক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করার প্রথাকে বিধবা বিবাহ বলা হয়। মাঝি ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকে আন্তঃজাতি বিবাহ বলা হয়। এক্ষেত্রে সমাজের অনুমতি প্রয়োজন হয় স্বীকৃতির জন্য। মেয়ের অমতে জোরপূর্বক ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করলে এই বিবাহকে জোরপূর্বক বিবাহ বলে। এই প্রথা মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মাঝি বিবাহের পাত্র-পাত্রীর খোঁজখবর এনে দেয় সাধারণত ঘটক। ঘটককে বলা হয় 'লমি'। সাধারণত বাল্যবিবাহ প্রথা নেই এই সমাজে। কন্যা পণপ্রথাও এই সমাজে প্রচলিত নেই। বিধবা বিবাহ প্রথা আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাও চালু আছে। মাঝি বিবাহে সিঁদুর দান প্রথা আছে। মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহ সাধারণত দাহ করা হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃতদেহ কবর অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেবার প্রথাও আছে। মুখাগ্নি করে থাকে সাধারণত বড় ছেলে। মুখাগ্নির সময় মৃত ব্যক্তির মুখে একটি পয়সা একটুকরো সোনা এবং একটি বাতি (প্রদীপ) রেখে মুখাগ্নি করা হয়। এই প্রথাকে 'দাগবাত্তি' বলা হয়। সাধারণত এক, তিন, পাঁচ অথবা সাত দিন পর্যন্ত লবণ, তেল, মাছ, মাংস খাওয়া বারণ থাকে এই সময়। নয় দিনের দিন সাধারণত শ্রাদ্ধকর্ম হয়ে থাকে। শিশুর মুখে ভাতের আগে মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধ কর্ম করা হয় না। তবে বর্তমান সময়ে অন্যান্য প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই।

প্রমোদ নাথ

ডুয়ার্সের মুখ

ওরা পঞ্চপাণ্ডব

মহাভারতের কুরুবংশীয় পঞ্চপাণ্ডব নয়। কিংবা কিশোর উপন্যাসের রহস্য রোমাঞ্চময় কাল্পনিক চরিত্রও নয়। কখনও পিতার মতো, বন্ধুর মতো, কখনও আবার অভিভাবক হয়ে অসহায়, দুঃস্থ, নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া কয়েকটি মুখ। সেই মুখগুলি মহীরুহের মতো ছায়াময়, তারও চেয়ে বেশি মায়াময়। মৃন্ময় ঘোষ, সঞ্জয় সরকার, দোসাসু বর্মন, বিদেশ সিংহ ও রামকৃষ্ণ বর্মণ। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরিজীবী। জীবন জীবিকার আড়ালে সমাজসেবাকে ব্রত করেই এদের চরৈবেতি, গড়ে তুলেছেন পঞ্চপাণ্ডব নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জামালদহে ২০০৩-০৪ থেকে যাত্রা শুরু পঞ্চপাণ্ডবের।

বিশ্বের ৫২টি দেশে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার যখন সাড়ম্বরে পালিত হয় বাবা দিবস তখন জামালদার ১৪ জন পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ। অত্যন্ত দরিদ্র এইসব ছেলেমেয়ের খাওয়া-পড়ার দায়িত্বই শুধু নয়, তিনি তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী হবার পথও সুগম করেছেন। তাই তো ফাদার্স ডে-তে সারবানু খাতুন, এজাজুল হক, অঞ্জলী শীল, মিলন বর্মনের মতো শিশুরা নতুন করে খুঁজে পেয়েছে তাদের পিতাকে।

মেধা যাদের চরম দারিদ্রতাকে ছাপিয়ে মাথা তোলে, মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে ইচ্ছেপূরণের স্বপ্ন, তাদের ইচ্ছেপূরণের সিঁড়িগুলি পেরিয়ে যাবার পথ মসৃণ করে তোলে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের উচলপুকুরির প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র টিঙ্কু দাস। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে স্টার পেয়েছে। দিনমজুর বাবার সামান্য আয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যেত যদি না মৃন্ময়বাবুরা বাড়িয়ে দিতেন তাদের হাতগুলি। টিঙ্কুকে জলপাইগুড়ি এসি কলেজে ভর্তি করে বইপত্র ও টিউশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সংস্থাটি। এরকমই দুঃস্থ, মেধাবী ১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে নিজেদের উদ্যোগে কলেজে ভর্তি করে তাদের লেখাপড়ার সমস্তরকম ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়ে চলেছে সংস্থাটি। জামালদহ, উচলপুকুরির রতন, শিবু, মৃণাল, নারায়ণ, বীরেনজিৎ, টিঙ্কু, বিজয়, পার্থ, সঞ্জয়, মনোজ—কেউ বা হতে চলেছেন ডাক্তার, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার।

দরিদ্র দিনমজুর রিকশাচালক, ভ্যানচালক পরিবারের মেধাবী এই ছাত্রদের হয়ত কোনওদিনই এগিয়ে চলা হত না, যদি না পঞ্চপাণ্ডব পাশে থাকত। ঠিকা শ্রমিক বাবুল বর্মনের মা'কে আর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় না। লাইনে কাজ করবার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত বাবলুকে পঙ্গুত্বের পথই বেছে নিতে হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব ফিজিয়োথেরাপি সেন্টারে ব্যবস্থা করে দেন। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে অনেকটাই সুস্থ বাবলুকে সংস্থার পক্ষ থেকে কিনে দেওয়া হয় একটি ট্রাই সাইকেল এবং নগদ অর্থ সাহায্য। ট্রাই সাইকেলের সাহায্যে বাবলু এখন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে। জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে লটারির টিকিট বিক্রি।

চ্যাংরাবান্দার কলসিবান্দা গ্রামের দিনমজুর কমিজুদ্দিনের পাঁচ বছরের শিশু আবুল কালাম বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে দৃষ্টিশক্তির অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল। প্রশাসনিক তৎপরতা ও পঞ্চপাণ্ডবের ক্লাবের সদস্যদের সহযোগিতায় দীর্ঘ তিন মাসের চিকিৎসায় ফিরে পায় তার দৃষ্টিশক্তি। নদী চরে বসবাসকারী পরিবারগুলির দুর্দশাই নিত্যসঙ্গী। এদের না আছে পরিশ্রুত পানীয় জল, না চিকিৎসা ব্যবস্থা, না বিদ্যুৎ। এই বঞ্চিত মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব। পঞ্চপাণ্ডবের উদ্যোগে নদীর চরের বাসিন্দাদের জন্য লাগানো হয় সৌরবাতি। বন্যা কবলিত এই অঞ্চলের মানুষগুলির জন্য কম্বল, মশারি, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করছে পঞ্চপাণ্ডব। সংস্থার উদ্যোগে এবং কোচবিহার জেলা পরিষদের সুচিস্মিতাদেবীর সহযোগিতায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শৌচালয় নির্মাণ করা হয় যৌনপল্লির নাগরিকদের জন্য। একজন যৌনকর্মীকে কর্নিয়াও দান করেন তারা। এই বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্য তারা তাদের ব্যক্তিগত আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই দান করে দেন ক্লাব ফান্ডে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যখন চারদিক হিংসা, হানাহানি, স্বার্থপরতা, পাশবিকতার বিষবাষ্পে ভরে উঠেছে, তারই মধ্যে মুক্তমনের বোধ ও চেতনার দরজা জানালা খুলে এক আঁচলা বিশুদ্ধ বাতাস সমাজকে উপহার দিয়ে চলেছেন জামালদহের পঞ্চপাণ্ডব।

অঞ্জনা ভট্টাচার্য

বানেশ্বরের মোহনদের ছবি এখন ফেসবুকে

মোহনরা এখানে স্বাধীন। ওরা পাড়ে নির্ভয়ে ঘোরে, দিঘীর জলে সাঁতার দেয়। এই ডুব দেয় তো পরক্ষণেই ভুস করে ভেসে ওঠে। এই মোহনদের এখানে কচ্ছপ বলে ডাক স্থানীয় মানুষ শুনে ফেললেই সমূহ বিপদ। যদি শোনে তাহলে সতর্ক করে দিয়ে দর্শনার্থীদের বলে দেয় তাদের আত্মার আত্মীয় এই কচ্ছপদের যেন মোহন নামেই ডাকা হয়। কচ্ছপের নাম মোহন কী করে হল শুধালে বলে, শয়ে শয়ে বছর আগের থেকে আছে এই মোহনরা, কে বা কেন যে ওদের মোহন নামে ডেকেছিল তখন তা আমাদের পিতৃপুরুষরাও জানত না। বহু যুগের পরম্পরায় মোহন নাম আজও প্রচলিত। মোহন বাঁশির মতো নাকের জন্য হবে হয়ত। কারণ চরিত্র ও প্রকৃতিতে এরা বটল নোজ টরটয়েজ। কর্কর খাদ্যশৃঙ্খলে প্রথম শ্রেণির খাদক এরা। পচা বিয়োজিত খাবারে এখানকার মোহনরা স্বচ্ছন্দ। পাশের শিবমন্দিরে নৈবেদ্যের ফলমূল চাল কলা মোহনদের জন্যই ফেলা হয় দিঘীর জলে। মোহনরা সেসব খায়। আজেবাজে জিনিসপত্র ফেলত বলে দর্শনার্থীদের খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া নিষিদ্ধ এখন। বহু বছর আগে মন্দিরের বাইরের দোকানে মোহনের জন্যই মুড়ি মুড়কি বিক্রি হত। এখন সেসব দোকানও নেই, মুড়ি মুড়কিও নেই। তবু ছোট বড় মাঝারি 'মোহন' কচ্ছপরা দল বেঁধে দিঘীর সান বাঁধানো ঘাটে এসে প্রতিদিনই খাবারের লোভে ভিড় জমায়। আর তখনই ওরা ডিজিটাল বা মোবাইলের ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হয়ে যায়। ঘাটের সিঁড়ির জল লাগোয়া শেষ সোপান মোহনদের সঙ্গে বসে নব বিবাহিতাও পোজ দেয়। আর সেইসব ছবি ক্রমে ফেসবুকে পোস্ট হয়। দু'শো-তিনশো বছর বয়সি মোহনদের এ কালে কী ভাগ্যি !

স্থানীয় মানুষ এই কচ্ছপদের ধরে বেচে দেয় না বা খেয়ে ফেলে না। কূর্ম অবতারের প্রতিনিধি মোহনরা শিবের বাহন বলে স্থির বিশ্বাস ওদের। এই ধর্মীয় অনুশাসন মোহনদের বাঁচিয়ে রেখেছিল সেকালে। তারপর মাঝের সময়টা মোহনদের চলাফেরা সাঁতার দেখতে দেখতে অভ্যস্ত মানুষ হয়ে গিয়েছিল ওদের খুব কাছের কেউ। মোহনরা তখন মানুষের আদরের, স্নেহের পাত্র। আবার এখন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে সচেতনতা। তাই একালে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মোহনদের দেখভালের অর্থ কার্যত বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ। দিঘীর চারদিক তার জালে মোড়া। মোহন কচ্ছপরা যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে। আর বেরিয়ে গেলেও অন্য কোথাও যাবার কোনও উপায় আছে নাকি ওদের। স্থানীয় মানুষের চোখে পড়লেই তাকে ধরে নিয়ে এসে আবার মুক্ত করে দিয়ে যায় দিঘীর জলে। এমনকি গত শতকের বন্যায় জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া কচ্ছপদের আশপাশের কোনও পুকুর বা ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের বনতি নদীর জলে জেলের জালে ধরা পড়লেই তার গতি সেই বানেশ্বরের দিঘীর জল। গুপ্ত যুগীয় স্থাপত্য রীতির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বানেশ্বর এখানকার দেবাদিদেবের আর এক নাম। দেবতার মাহাত্ম্যে স্থানের নামও তাই বানেশ্বর।

কথিত দানব শৈব বানাসুর নিজ বাটিতে শিবের প্রতিষ্ঠায় শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছিলেন। দেবাদিদেবের শর্ত ছিল যেখানেই বানাসুর মাথা থেকে লিঙ্গ নামিয়ে রাখবে সেখানেই সে থেকে যাবে। শিবের কথায় কোনওরকম নড়ন চড়ন হবে না। যেতে যেতে পথে বানাসুরের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হতে হয়। মাথায় শিব লিঙ্গ রেখে মূত্র ত্যাগ পাপ বলে বিবেচিত। লিঙ্গ মাথা থেকে নামিয়ে রাখায় বানাসুরের ঈশ্বর-বানেশ্বর নামে এখানে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাত হয়। এ নদীর জল তাই দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার কাজে আসে না। রেচনজাত তরল কিনা। তবে মানুষের অন্যান্য সব কাজেই লাগে বনতি নদীর জল।

কোচবিহার শহর থেকে বানেশ্বর খুব একটা দূরে নয়। কোচবিহার শহরে রাজপ্রাসাদ, মদনমোহন দেবের মন্দির ঘুরে বিশ-পঁচিশ মিনিটে বাস অটো করে এসে বানেশ্বরের শিব মন্দির, বনতি নদী আর মোহন ও তাদের আবাসস্থলে এসে প্রাচীন স্থাপত্য আর বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন দেখে নেওয়া যায়। আর তা দেখে মানব মনে সার্থক হয়ে ওঠে। কেবল মানুষই পারে প্রাচীন স্থাপত্য ও বন্যপ্রাণের যুগপৎ সংরক্ষণ। পাশাপাশি, একসঙ্গে।

গৌতম কুমার দাস

গল্প

শিকার

শ্বেতা সরখেল

‘কে আছস দেইখ্যা যা কি আনসি।’ চিৎকার করে হাঁক পাড়তে পাড়তে ফিরলেন বাড়িতে। নেওড়ানদী চা-বাগানের ফ্যাক্টরিবাবু কালিদাস মুখুজ্যে। দশাসই চেহারা। গায়ের রং কালো। ছ'ফুট হাইট। ঢোলা একখানা হাফপ্যান্ট আর গায়ে ঢলঢলে একটা শার্ট। দু'টোই খাঁকি। পায়ে গামবুট। বাঁ-হাতে দোনলাটা ধরা আর ডান হাতে? সেটার জন্যেই তো তাঁর কণ্ঠস্বরে এত জোর। মানুষ হিসেবে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তত অহংকার নেই যতটা বাহুবল নিয়ে। বন্দুক আছে, গুলি আছে, জিত তো হবেই। তবুও বোকার মতো অহংকার। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই করলে তবে তো জয় পরাজয়ের বিচার। নিরস্ত্র নিরীহ অবস্থায় গুলি চালিয়ে হত্যা করে কেউ কখনও জয় দাবি করতে পারে কি? কালিদাস মুখুজ্যে তাই করতেন। বিশাল এক মৃত চিতাবাঘকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে যখন নিয়ে এলেন নিজের কোয়ার্টারের সামনে তখন সকালের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফ্যাক্টরিবাবুর গম্ভীর গর্জনে আশপাশ থেকে জনসমাগম হয়ে গেল। আর কোয়ার্টারের ভেতর থেকে একে একে বেরিয়ে এল নেড়ামাথা, খালি পা নোংরা নোংরা জামা পরা পাঁচটা মেয়ে আর নাক দিয়ে সিকনি পড়া দু'টো নেড়ামুণ্ডি ছেলে। সর্বসাকুল্যে সাতটা। সঙ্গে তাদের মা-ও। চা-বাগানের চাকরিতে দাপট ছিল সে সময়। মাঝখানে চিতাবাঘের শব আর তাকে ঘিরে জনা তিরিশেক লোকের হুল্লোড়। ছোট্ট ছোট্ট কচিকাঁচারা কেউ ল্যাজ ধরে টানে কেউ কানটা একটু মলে দেয়। বড়রা আবার একটু বেশি সাহসী। দাঁতে হাত দিয়ে দেখে, নখে হাত দিয়ে দেখে। ভাবখানা এমন, বাঘের গায়ে হাত দিচ্ছি দ্যাখ। বুকটা দুলে উঠছে তাদেরও। কালিদাসের স্ত্রী লীলাবতী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে একটা টুল এনে দিলেন স্বামীকে। রাজকীয় চালে তার উপর বসলেন কালিদাস। ফিটারবাবু, বড়বাবু যে যার ঘরে বসেই খবর পেয়ে গেলেন। আসার সময় বড়বাবু সমীরণ সান্যাল তাঁর শখের ক্যামেরাটা নিয়ে এলেন সঙ্গে।

—কী ব্যাপার মুখার্জিদা, আজ তো সকাল সকাল দারুণ কাণ্ড ঘটালেন মশাই!

কালিদাস মুখে তৃপ্তির হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন,

—আর কন ক্যান, রোজ রোজ কি আর সুবিধা মেলে? কাইল হেইডারে মারণের লেইগা রাত্র দুইট্টা থেইক্যা চ্যাপ্টা কইরা সকালবেলা আবার হদিস পাইলাম।

—তার মানে? বের হয়েছিলেন রাতে?

—হ। যেমন যাই।

—আপনার দাদা সাহসের বলিহারী!

কালিদাসের মুখে বিনম্র অথচ অহংকারী হাসি দেখা দেয়। সমীরণ বললেন,

—দাদা, আপনার কয়েকটা ছবি তুলব। একটু বাঘটাকে নিয়ে বসবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বসুম না ক্যান? তুমি কইস আইর আমি শুনুম না?

ছেঁচড়ে বাঘটাকে টেনে আনলেন নিজের পায়ের কাছে। নিজে টুলে বসে একটা পা তুলে দিলেন বেচারা মৃত চিতার পিঠের উপর। তারপর স্ত্রীকে বললেন,

—যাও তো লীলা আমার বন্দুকটা আনো তো।

লীলা দ্রুত পায়ে ঘরে গিয়ে নিয়ে এসে দোনলাটা এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। বাঁ'হাতটা বাঁ'পায়ের উপর আর ডান হাতে খাড়া করে

ধরলেন বন্দুক। ছবি তোলার পোজ দিলেন। সমীরণ নানান কোণ থেকে ছবি নিলেন খুশিমতো। কালিদাসের মুখে উজ্জ্বল হাসি। নানান ভঙ্গিমায় আর নানান জনকে সঙ্গে নিয়ে ফোটো সেশন শেষ করে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেল এক এক করে। কয়েকজন লেবার মিলে বাঘকে ঢুকিয়ে দিল ফ্যাক্টরিবাবুর কোয়ার্টারে। উঠোনের মধ্যিখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বাঘ। আর হত্যাকারী ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে স্নানাহার সেরে বিশ্রাম নিচ্ছেন এত বড় এক কাজের সফল সমাপ্তির তৃপ্তিতে। ছ'টা বাচ্চা ঘুরে ঘুরে লাফাচ্ছে উঠোনে। ওদের মজাই আলাদা। বলদর্পী পিতার জন্যে গর্ব হয়েছে ওদেরও।

এরপর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বারে বারে। বাড়িতে ভোজনের বৈচিত্র্যও দেখার মতো। তবে বাঘের মাংস খাওয়া যেত না বলে সে খানিকটা বেঁচে যেত। মেজো মেয়ে কোনওদিন বলে বসল,

—বাবা, আজকে আর মোরগ আনবা না, অনেক খাইচি। অন্য পাখি আইনো।

—যথা আজ্ঞা।

চার নম্বরের আবার অন্যরকমের বায়না।

—অনেকদিন খরগোশ খাই না। আজকে খরগোশ আইনো তো।

ছোট ছেলের আবদার বাবা ফেলতে পারেন না। সর্বকনিষ্ঠকে কোলে টেনে নিয়ে বাবা বললেন,

—তর কি ইস্যা ক।

বাবার গলায় ঝুলতে ঝুলতে ছোট ছেলে আবদার করল,

—বাবা, একটা হরিণ খাব।

হরিণ আর খরগোশটা কালিদাসের নিজেরও খুব পছন্দের। তাই মাঝে মাঝেই ওদু'টো চলে আসে লুটোতে লুটোতে। লেবারেরা ছাল ছাড়িয়ে কেটে কুটে প্রস্তুত করে দিলে কালিদাস নিজেই এদু'টো মাংস রান্না করেন বিরাটাকৃতি কড়াইয়ে। কষা করে। ঝাল দিয়ে। লালরঙা মাংস দিয়ে দুপুরের রাতের জিভে জল আসা ভোজ। আহা লোভনীয় বটে! মোরগ, ময়ূর কিংবা অন্যান্য জাতের পাখি হলে সেসব লীলাই রান্না করেন। সেগুলো এলেবেলে।

কালিদাসের বড় মেয়ে জলপাইগুড়িতে নামী স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। হোস্টেলে থাকে। চেহারায় অন্যান্য সব ভাইবোনেদের থেকে আলাদা। যখন সে কোয়ার্টারে আসে তখন সকলেই বুঝতে পারে এ শহুরে মেয়েটা ফ্যাক্টরিবাবুর বড় মেয়ে। পায়ে জুতো মোজা, চোখে চশমা, পরিধানেও একটু অন্যরকম ছোঁয়া। বাকি পাঁচটা মেয়ের বেলায় একথান ছিট কাপড় কিনে এনে কালিদাস নিজে হাতে জামা বানিয়ে দেন সেলাই মেশিনে। ছেলে দু'টোর শার্টও ওই একই কাপড়ে হয়ে যায়। কিন্তু সে থানের একটু অংশও বড় মেয়ের জন্য থাকে না। তার জামা কেনা হবে মাপ মতো শুধু তাই নয়, তার পছন্দ মতোও। বাকি সকলের পায়ে প্লাস্টিকের চটি নানান সাইজের। মাথা ন্যাড়া করা হলে সকলের একসঙ্গে করে দেওয়া হয়। কিন্তু বড় মেয়ে সন্ধ্যাশ্রীর বেলায় তার লম্বা চুলে হাত পড়ে না কক্ষণও। এহেন পক্ষপাতিত্ব থেকে কোনওভাবেই বের হতে পারতেন না কালিদাস। অবশ্য পারতেন না তা নয়, বের হতে চাইতেনও না। লীলার কষ্ট হত বাকিগুলোর জন্য। আর ছোটগুলো হিংসে করত দিদিকে। দিদির সবকিছু স্পেশাল। বাবার উপর রাগও হত। আবার এ-ও সত্য, দিদি যখন বোর্ডিং থেকে ছুটিতে বাড়িতে আসত তখন দারুণ আনন্দে লাফালাফি জুড়ে দিত ভাইবোনেরা। সন্ধ্যাশ্রী খুব শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। বয়স অনুযায়ী একটু বেশিই পরিণত যেন। বাবা অনেক সময়েই বড় মেয়ের সঙ্গে নানান শলাপরামর্শ করতেন। হয়ত তাতে সবসময় সমস্যার সঠিক সমাধান হত না তবুও কালিদাস এ গুরুত্ব বড় মেয়েকে দিয়েই যেতেন। হয়ত শহরের ভাল স্কুলে পড়ার কারণেই ওর বোধবুদ্ধি সম্পর্কে একটি সম্মানের জায়গা তৈরি হয়েছিল পিতার।

দুর্গাপুজোয় প্রতিবছরের মতো ছুটিতে সেবারও বাড়ি এসেছিল সন্ধ্যাশ্রী। সারাদিন মণ্ডপে ব্যস্ত। হইহই করে কেটে গেল পুজো। তারপর লক্ষ্মীপুজো। বাড়িতে বিশাল আয়োজনে লক্ষ্মীপুজো হয়। লীলা-ই তার বন্দোবস্ত করেন। বাগানের অনেকে নিমন্ত্রিত থাকেন সেখানে। এই আয়োজনের মধ্যেও যেন কালিদাসের একটু হলেও অহং ধরা পড়ে। বাপের এই অহংবোধটাতে অখুশি ছিল একজনই। সন্ধ্যাশ্রী। মুখে বলত না কিছু। কিন্তু মনে মনে সইতে পারত না। কোজাগরির দিন দুই পরের ঘটনা। বাবার শিকার করার ব্যাপারটায় আর সকলের মতো সন্ধ্যাশ্রীও যথেষ্ট পরিচিত। ছোট্টবেলা থেকেই দেখে আসছে। সেদিন সন্ধে হতেই কালিদাস হঠাৎই দোনলাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জঙ্গলের দিকে। সন্ধ্যাশ্রী পায়ে পায়ে কোয়ার্টারের গেট পর্যন্ত এগিয়ে এল বাবার সঙ্গে। সঙ্গে লীলাও। যাবার সময় বলল,

—বাবা, সাবধানে যেও, আর তাড়াতাড়ি ফিরো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনও চিন্তা নেই, কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ফিরা আসুম। এই ধর দশটা হইব। তাইর অধিক রাইত করুম না।

—ঠিক আছে।

লীলা বলল,

—দুগ্গা দুগ্গা।

রাত বাড়তে লাগল। ছোটরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে বসে আছে মা মেয়ে। রাত বারোটা। লীলার অস্থির পা একবার ঘর আর একবার বারান্দা করছে। ঘরে এসেই চলে যাচ্ছেন গৃহদেবতার আসনে। প্রণাম করছেন গলবস্ত্র হয়ে। সন্ধ্যাশ্রী চুপচাপ বিছানার উপর বসে ঘড়ির টিকটিক শুনছে আর কান খাড়া করে রেখেছে বাইরের আওয়াজের দিকে। নৈঃশব্দের মধ্যে ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। পাখির আওয়াজ। রাত্রি দু'টো বেজে গেল। দুশ্চিন্তায় মন ছটফট করছে লীলার। সন্ধ্যাশ্রী সামলে রেখেছে মা'কে।

—দাঁড়াও না, এখনই এত চিন্তার কী আছে? এর আগেও তো বাবা এমন কাণ্ড করেছেন। তখন তুমি একাই সামলেছ। এখন তো আমিও আছি তোমার সঙ্গে। সেরকম বুঝলে সান্যালকাকু, ঘোষকাকুদের ডাকব।

—আমার মনডা ভাল লাগতাসে নারে। খুব ছটফট করতাসে। এইর আগে এত দেরি হয় নাই। সন্ধ্যায় গিয়া বারোটার মইধ্যে চইলে আইসেন তর বাবা।

ভোর পাঁচটা। প্রকৃতি মুখ থেকে অন্ধকারের ঘোমটা সরাচ্ছে। পূব আকাশে লালের ইঙ্গিত। হঠাৎ গেটে আওয়াজ হল। দ্রুত পায়ে দরজা খুলে এগিয়ে গেল মা মেয়ে। কালিদাস বিধ্বস্ত এলোমেলো চুলে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা দশাসই চেহারায় বাড়ি ফিরলেন জয়ী হওয়ার এক বুক আনন্দ নিয়ে। গেট খুলে উঠোনে এনে ফেললেন বিশাল চেহারার এক বাঘ। বাঁহাতে ঝোলাতে ঝোলাতে ছোট্ট একটা খরগোশ। দু'জনেই চোখ বোজা। উঠোনে ফেলে দিয়ে সোজা কলপাড়ে গিয়ে হাতমুখ সব সাফসুতরো হল। লীলা তো শশব্যস্ত পায়ে গামছা জামাকাপড় হাতে নিয়ে স্বামীসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বারান্দায় থামটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যাশ্রী। সারারাতের দম আটকানো পরিস্থিতির পর এইরকম দু'টি মৃতদেহ। আর সেইসঙ্গে বাবার এত গর্বিত হওয়া মুখশ্রী। সবটা মিলিয়ে সন্ধ্যাশ্রী যেন আর পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে না বহুক্ষণ। বাবার সাহস আছে, সত্যিই তা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাই বলে এই নিরীহ প্রাণী দু'টি কী অন্যায় করল! কী অবোধ দুটি প্রাণী শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে জঙ্গল আলো করে তাদের সুষ্ঠু জীবনযাপন করছিল। আর মা? মা জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে তার নিজের সখ আহ্লাদ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে স্বামীসেবা আর সন্তান প্রতিপালনের মতো কঠিন দায়িত্ব মুখ বুজে দিনের পর দিন পালন করে যাচ্ছেন, এতটুকু প্রশংসাও কি তাঁর প্রাপ্য নয়! আর বাবা! মায়ের দুশ্চিন্তার কথা না ভেবে তাঁর ভাল লাগা না লাগার কথা না ভেবে এমনকি প্রাণী দু'টোর প্রাণের কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের সাহসের বড়াই করার জন্যে, আর একটু হালকা প্রশংসা পাওয়ার লোভে এই অন্যায় কাজ দিনের পর দিন করে চলেছেন! অথচ কেউ তাঁকে বলবার নেই, বোঝাবার নেই! ভেতরে ভেতরে বাবার প্রতি ক্ষোভ হয় ঠিকই কিন্তু তার চাইতে বেশি

হয় করুণা। বাবা-ই বেশি করে অবোধ, হয়ত বা ওই প্রাণীগুলোর চাইতেও।

হাত-মুখ ধোওয়া হলে বাবা উঠোনে টুল এনে বসলেন। লীলাকে ডাকলেন। খরগোশটাকে দেখিয়ে বললেন,

—হেইডারে আইজ আমি রান্ধুম। আমার বড় মাইয়ার লাইগ্যা।

লীলা বললেন,

—কাটবা তুমি নিজেই?

—হ্যাঁ। রামুরে ডাকসি, ছুইল্যা দিয়া যাইব।

সন্ধ্যাশ্রী দাঁড়িয়েছিল বারান্দাতেই। ওর দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই বাবার। ধরেই নিয়েছেন খুব খুশি হয়েছে মেয়ে। এক্ষুনি এসে জড়িয়ে ধরবে বাবাকে। বাকিরা যেমন করে। কিন্তু বড় মেয়ে একটু অন্য ধাচে গড়া। বুঝতে পারেননি কালিদাস মুখুজ্যে। গুমোট সন্ধ্যাশ্রী দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। চোখ ভর্তি টলটল করছে জল। প্রত্যুষের সেই আলগা ছিটোনো আলো ওর মুখে পড়েনি এখনও। কিন্তু ওই আলতো আলোয় নিষ্পাপ খরগোশ আর চিতাবাঘের ঘুমন্ত চোখ দু'টো ও দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট।

লীলা চা বানাতে গেলেন ভেতরে। যাবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েকে লক্ষ করে ঠিক ধরে ফেললেন ওর মনে অন্য কিছু খেলছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে একবার আপাদমস্তক পড়ে নিলেন মেয়েকে। পাশাপাশি এসে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুই চা খাবি তো? তাইলে তিন কাপ বসাইলাম।

নিরুত্তর সন্ধ্যাশ্রী। লীলা চলে গেলেন ভেতরে।

ফর্সা হচ্ছে পৃথিবী। সন্ধ্যাশ্রী খুব ধীর পায়ে এগোতে লাগল বাবার দিকে। বারান্দা থেকে নেমে একটু একটু করে এগোচ্ছে বাবার দিকে। বাবা বললেন,

—আয় সইন্ধ্যা। আয় মা। তর লেইগ্যা আইজ খরগোশডারে আনসি। খাওনের লেইগ্যা। আর বাঘডারে দ্যাখ। ওইডারে মারসি তরে দ্যাখানের লেইগ্যা। তর বাবা কেমন শিকারী হেইডাই দ্যাখ একবার। আইজ আমি নিজের হাতে রান্ধুম।

ধীর পায়ে বাবার আরও কাছে গেল সন্ধ্যা। একেবারে কোলের কাছে। কোলে গিয়ে বসল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে। হাউ হাউ করে চাপা কান্না বাঁধ ভাঙল বাবার কাঁধে। কালিদাস তো কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারলেন না প্রথমটায়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন মেয়ের কাণ্ড দেখে। একটুখানি সময় নিলেন। তারপর জড়িয়ে ধরে বললেন,

—কী হইল আমারে ক। কান্দস ক্যান্? তুই তো আমার কান্দনের মেয়ে নস। ক আমারে। কোথায় কষ্ট হইতেসে ক।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাথা তুলে বসল বাবার কোলে। বলল,

—বাবা তুমি এইভাবে এদের মেরোনা।

—মানে? কী কস তুই? সক্কলে মাংস খাইতে অ্যাত্ত ভালবাসে আর তুই কস মাইরো না? ক্যান্ রে?

—আমি খাব না বাবা। কী দোষ করেছে ওরা? তোমার কোনও ক্ষতি করেছে কি? তাহলে কেন ওদের তোমার বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে? খরগোশটাকে খাওয়ার জন্যে এনেছ? কেন বাবা? খেতে পাও না তুমি? বাজারে মাংস পাওয়া যায় না? আর বাঘটা? ওকে মারলে কেন?

—দ্যাখানের লেইগ্যা।

—কী দ্যাখাবে? তোমার কত সাহস? তাতে লাভ? ওর প্রাণের কি কোনও দাম নাই? ওর কি পরিবার নেই? তারা যে কাঁদছে!

এতগুলো প্রশ্নচিহ্নের বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কালিদাসের মনের পাথর নরম হয়ে আসছিল। এতকালের এত বড় শখ শুধু মেয়ের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে কি? নিজেই একটা বিরাট আকারের প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালেন কালিদাস। দোদুল্যমানতায় দুলতে দুলতে খেয়ালই করেননি লীলা চা নিয়ে চলে এসেছেন কখন। হঠাৎ সম্বিত ফিরল স্ত্রী'র কণ্ঠস্বরে।

—মেয়েতো ঠিকই কইতাসে। আমি যা এতদিন কইতে পারি নাই তা আইজ তোমার মেয়ে কইসে।

চমকে উঠলেন কালিদাস। স্ত্রী'র মুখেও এতবড় কথা! কই অ্যাদ্দিন তো শোনেননি? অবশ্য শুনতে চানওনি।

—তুমিও কইতাস লীলা?

চা নিয়ে বসল তিনজনে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। চা খাওয়া হলে সন্ধ্যা ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত ভাইবোনেদের পাশে। লীলা স্বামীর স্নানের জল বসালেন উনুনে। সমস্ত বাড়িটাকে একটা অজানা নীরবতা গ্রাস করে নিয়েছে আজ। এতক্ষণে সূর্য তার কিরণ ছিটিয়েছে অনেকটাই। নতুন সকাল শুরু হয়েছে নতুন কোনও বার্তার অপেক্ষায়। গুমোট পরিবেশটা কাটার আগেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ওঠার আগেই ঘটনাটা কাটিয়ে ফেললেন কালিদাস। রামু চলে এসেছে উঠোনে, ছোট্ট খরগোশের ছাল ছাড়ানোর জন্য। ফ্যাক্টরিবাবু দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তাকে। স্নান সারার আগে ঘর থেকে কোদাল নিয়ে এলেন উঠোনে। বিশাল উঠোনের এক কোণে একটা বড় কদম গাছের তলায় গর্ত খোঁড়ালেন রামুকে দিয়ে। খরগোশকে নিয়ে এগোলেন সেদিকে। পেছন পেছন সন্ধ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। গর্তের কাছে পৌঁছে সন্ধ্যা বলল,

—বাবা, আমাকে দাও। দ্যাখো এইভাবে নিতে হয়।

মৃত খরগোশকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে যত্ন করে গর্তের ভেতর শুইয়ে দিল সন্ধ্যা। গর্ত বুজিয়ে দিয়ে ফুল ছড়িয়ে দিল তার উপর। তারপর বাবার দিকে ঘুরে বলল,

—আর ওর জন্যে?

কালিদাস তাঁর সমস্ত দম্ভের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এতক্ষণে। বললেন,

—তর কথা আমি রাখুম। আর শিকার করুম না। কিন্তু এই

> ধীর পায়ে বাবার আরও কাছে গেল সন্ধ্যা। একেবারে কোলের কাছে। কোলে গিয়ে বসল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে। হাউ হাউ করে চাপা কান্না বাঁধ ভাঙল বাবার কাঁধে।

শ্যাষবারের মতো আমার একটা কথা তরেও মানতে হইব।

—বল।

—এই চিতাবাঘডারে আমি কবর দিমু না। হেইডারে ঠিকঠাক বানাইয়া আমি ঘরে সাজাইয়া রাখুম। এইটুকু কথা রাখতে হইব তরে।

সন্ধ্যাশ্রী এগিয়ে এল বাবার কাছে। জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে। বুকের কাছে মাথা রেখে বলল,

—বেশ, তাই হবে।

বাঘকে সঙ্গে নিয়ে একটু পরেই কালিদাস বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। ফিরলেন প্রায় সন্ধেয়। সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকারে মুছে গেল এতকালের সমস্ত পাপের চিহ্ন। রাতে বৃষ্টিও নামল সেদিন। ধুয়ে গেল লীলার মনের গুমোট।

পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার বাড়ি এল সন্ধ্যাশ্রী। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল সেই বাঘের শরীরটা কাঁচের বাক্সে বন্দি। হেসে ফেলল সন্ধ্যা। থাকতে থাকতে বুঝতে পারল মা আজকাল অনেক বেশি হাসে। অনেক বেশি কথা বলে। মন খুলে। বাবাও পালটে গিয়েছেন অনেক। বাজার থেকে পাঁঠা আর মুরগির মাংস নিয়ে এলেন ছুটিতে মেয়েকে ভালমন্দ খাওয়াবেন বলে। নিজে রান্না করার অভ্যেসটা এখনও ছাড়েননি বাবা। কষা কষা গরম মাংস দিয়ে দুপুর আর রাতের ভাত জম্পেশ করে খেল সবাই মিলে। হাসতে হাসতে। মশকরা করতে করতে।

অঙ্কন: সুবল সরকার

ধারাবাহিক উপন্যাস

বসন্তপথ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

১৯

'মিমি নন্দিতার হাতে পুডিংয়ের একটা বোল দিয়ে বললেন, 'কেমন খেতে হয়েছে রে?'

বোল থেকে এক চামচ পুডিং মুখে দিল নন্দিতা। তারপর তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা মুদ্রা তৈরি করে দেখাল।

মিমি ছদ্ম কোপ দেখিয়ে বললেন, 'তোদের ওসব কায়দা আমি বুঝি না। কেমন লেগেছে সেটা মুখে বল।'

নন্দিতা হো হো হেসে বলল, 'উম্‌ম কোনও কথা হবে না, জাস্ট ফাটাফাটি!'

দিল্লি থেকে বাগডোগরায় নেমে সপরিবারে সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন বিমলেন্দু। একমাত্র মেয়ের বিয়েটা সুখের হয়নি। ভালবেসে বিয়ে করে বিপাকে পড়েছিল মেধাবী নন্দিতা। সব পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করে এসেছে, বিয়ের পর পিএইচডি করার কথা। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলেছিল বিয়ের পর পিএইচডি করতে দেবে। এক উইকেন্ডে নন্দিতার স্বামী আসবে এ বাড়িতে আর আর এক উইকেন্ডে নন্দিতা যাবে শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু বিয়ের পর ওঁরা বেঁকে বসলেন। শুরু হল সমস্যা। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স।

তবে বিয়ে ভেঙে যাবার পর নন্দিতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। বরং নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছে। তার ফলও ফলেছে। এই সেদিন যথাস্থানে জমা করে এসেছে রিসার্চ পেপার। নন্দিতার পিএইচডি হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ছোটবেলা থেকেই অধ্যাপনা করার আকাঙ্ক্ষা নন্দিতার। এবার নেট পরীক্ষা দিয়ে সেই সাদ মেটাতে চায় সে। এত কিছুর পর নন্দিতার একটা চেঞ্জ দরকার। মূলত সে কারণেই এই সিকিম সফর। বেড়িয়ে ফেরার পথে জলপাইগুড়িতে দু'দিনের জন্য ভাইয়ের বাড়িতে বুড়িছোঁয়া করতে এসেছেন বিমলেন্দু।

বেতের চেয়ারটায় বসে মাধবী ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিলেন। পুডিংয়ের একটা বোল এবার মাধবীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন মিমি। মাধবী ম্যাগাজিনটা রেখে সেই পাত্র থেকে এক চামচ পুডিং মুখে দিলেন। আরামের একটা শব্দ করে জায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পিওর ম্যাজিক। দিল্লিতে আমি এটা অনেকবার ট্রাই করেছি। কিন্তু তোমার মতো এত ভাল করতে পারিনি কখনও।'

মিমি একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চকলেট বা অন্য কোনও ফ্লেবার নয়, তিনি ভ্যানিলা ফ্লেবার পছন্দ করতেন খুব। সে পুডিং হোক কিংবা আইসক্রিম। জোর করে মুখে উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে মিমি নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন ঘুরলি তোরা?'

নন্দিতা খুশি মুখে বলল, 'এই প্রথম সিকিমে পা রাখলাম। কী বলব কাকিমণি পুরো মুগ্ধ হয়ে গেলাম।'

মিমি হেসে বললেন, 'তোরা যেন কোথায় কোথায় গিয়েছিলি?'

নন্দিতা আঙুলে কড় গুনে গুনে বলল, 'রিশপ, সিলারিগাঁও, জুলুক, কুপুপ আর সবশেষে ঋষিখোলা। ওরেব্বাস কী ঠান্ডা কী ঠান্ডা... আমাদের গত সপ্তাহটা বোধ হয় ডিপ ফ্রিজে রাখা ছিল!'

মিমি হাসলেন, 'ফোটো তুলেছিস তো?'

নন্দিতা হেসে বলল, 'তুলিনি আবার! ইতিমধ্যে ফেসবুকে

আপলোডও করে দিয়েছি বেশ কিছু ফোটো। দ্যাখো দ্যাখো তিনশোর বেশি লাইক পড়ে গিয়েছে এই দু'দিনে। বাকিগুলো দিল্লি ফিরে গিয়ে ফোটোশপে এডিট করে তারপর আপলোড করব। দাঁড়াও তোমাকে দেখাব একটু পরে।'

মিমি বললেন, 'তার আগে সিকিমের কোথায় কোথায় তোরা গিয়েছিলি সেটা একটু বল। একটু মানসভ্রমণ করে আসি তোর কথা শুনে।'

নন্দিতা গুছিয়ে বসে বলল, 'বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে একটা গাড়ি ভাড়া করা হল। রিশপ পৌঁছলাম দুপুরে। রিশপ জায়গাটা জাস্ট অসাম। ছোট্ট জনপদ, পাহাড়কে অহেতুক ব্যস্ত না করে ঝুলে আছে নিজের মতো। বাইরে থেকে ওয়েদারটা তেমন বুঝিনি কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই বুঝলাম যে রিশপের ঠান্ডা হেলাফেলার বস্তু নয়, বরং বেশ জাঁকালো।'

মিমি হাসলেন, 'সেদিনটা রিশপেই থেকে গেলি তোরা?'

নন্দিতা এক চামচ পুডিং মুখে দিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'হুম সেদিন ওখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। দেওদার-পাইন-রডোডেনড্রনের ছায়া মাড়িয়ে, ঘণ্টা চারেকের পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে, বিকেলের দিকে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে সিলারি গাঁওয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। হোম স্টে সিস্টেম সদ্য চালু হয়েছে ওখানে। পাহাড়ি মানুষজন ভীষণ আন্তরিক। সিলারি গ্রামের সবাই দেখলাম ইকো-ট্যুরিজমে বিশ্বাসী। গোটা গ্রামে গাছ কাটা নিষেধ।'

মিমি বললেন, 'বাহ দারুণ তো।'

নন্দিতা বলল, 'পরদিন আমাদের জুলুক যাওয়া। সকাল দশটা নাগাদ সিকিমের গাড়ি ছাড়ল। পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি ফিরে গেল। ওদিকে ওটাই নিয়ম। তবে জুলুক-কুপুপ যাওয়ার জন্য অনুমতিপত্র লাগে। সিকিমে সিগারেট খাওয়া মানা। বাবা স্মোক করেছিল রাস্তায়। হি হি ধরা পড়া গিয়ে কত টাকা যেন দণ্ড দিল।'

বিমলেন্দু ওদিকটায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিমলেন্দুর কানে কথাটা গিয়েছে। একগাল হেসে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'গুনে গুনে পাঁচশো টাকা ফাইন নিল বদমাশেরা।'

উৎপলেন্দু বাজারে গিয়েছিলেন। এইমাত্র ফিরলেন। বাজারের থলে রান্নাঘরে রেখে এসে ডাইনিং রুমে ফ্যানের নিচে সোফায় বসেছেন। উৎপলেন্দুর দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মিমি বললেন, 'সিকিমের মতো আমাদের রাজ্যেও এই নিয়ম চালু হওয়া উচিত।'

উৎপলেন্দু জানতে চাইলেন, 'কোন নিয়মের কথা বলছ?'

নন্দিতা জরিমানা বৃত্তান্ত শোনাল উৎপলেন্দুকে। হেসে উঠলেন সকলে।

মিমি নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ এবার বল জুলুকে কী হল।'

নন্দিতা বলল, 'বোল্ডারে ভরা উঁচু রাস্তা পার করে এক সময় এসে পড়লাম জুলুকে। জায়গাটার হাইট সাড়ে ন'হাজার ফুটের মতো। শুনে মনে হবে এমন কিছু নয়, কিন্তু ইস্ট সিকিমের এই অঞ্চলে উচ্চতার তুলনায় ঠান্ডা অনেক বেশি। তুলোর মতো ঘন মেঘ উপত্যাকায় ভাসছে। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা। জনসংখ্যা বেশি নয়, মাত্র তিনশো মানুষের বাস জুলুকে।'

মিমি জানতে চাইলেন, 'তোরা ঠাঁই নিলি কোথায়?'

নন্দিতা বলল, 'ওখানে ছোট্ট একটা কাঠের বাংলো পাওয়া গেল। দুর্ধর্ষ একটা বারান্দা ছিল সেই বাংলোতে। কিন্তু ওদিকে এমন হাওয়ার দাপট যে দোতলার বারান্দায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানোই গেল না। রাতে ওই বাংলোতেই থাকলাম আমরা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি চকচকে নীল আকাশ। তার সঙ্গে মিঠে রোদ। সামছনে উপত্যকায় জুম চাষের বাঁধাকপির উপর বরফ-আয়না। বাংলোর রেন ওয়াটার পাইপের উপর জল বরফের দাগ। রাতে নাকি তাপমাত্রা ছিল শূন্যেরও দু'ডিগ্রি নিচে।'

মিমি বললেন, 'কুপুপ জায়গাটা কেমন?'

নন্দিতা বলল, 'পুরনো সিল্ক রুট ধরে কুপুপে যেতে হয়। প্রায় শ'খানেক বাঁক ঘুরে প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচু কুপুপে পৌঁছলাম পরদিন। কুপুপকে চিনের বর্ডার বলতে পারো। জার্নিটাও মেমোরেবল। সারা পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল কাঞ্চনজঙ্ঘা। কুপুপ ঘুরে ফিরে এলাম সেদিনই। পথে নাথান ভ্যালি আর হাতি লেক দেখলাম। শেষে অনেকটা নেমে এলাম ঋষিখোলা গ্রামে। ড্রাইভারের মুখে শুনলাম শীতকালে প্রচুর বনভোজনের দল যায় ওখানে। তবে মাইক-টাইক বাজায় না কেউ। ইকো-ট্যুরিজমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে যে ওদিকের লোকেরা।'

মিমি উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমারও একবার গিয়েছিলাম সিকিমে। তবে তোদের মতো ইস্ট সিকিম নয়, আমরা গিয়েছিলাম গ্যাংটক আর ছাঙ্গু। তিথি তখন বোধ হয় ক্লাস নাইন কি টেন। মেয়েটা কী যে খুশি হয়েছিল, দারুণ এনজয় করেছিল সেবারের সেই ট্রিপ।'

কোথাও বুঝি একটা অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা ছিল যে তিথির কথা এ বাড়িতে তোলা যাবে না। এবার মিমি নিজেই তিথির প্রসঙ্গ তুলে ফেললেন। আচমকা কেটে গেল সুর। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে।

নন্দিতা পুডিংয়ের বোল রেখে দিল পাশে। মাধবী সামনে পড়ে থাকা ম্যাগাজিনটা আবার তুলে নিলেন। উৎপলেন্দু সোফা ছেড়ে উঠে পাশের ঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন। বিমলেন্দু চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়ালেন না। কাপটা নামিয়ে এনে উৎপলেন্দুর উদ্দেশে বললেন, 'বোস এখানে আমার পাশে।'

উৎপলেন্দু বসে পড়লেন। উৎপলেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বিমলেন্দু বললেন, 'এত কিছু হয়ে গেল আর তোরা একবার ফোন করে সেটা জানাবার প্রয়োজন বোধ করলি না?'

উৎপলেন্দু মুখে কিছু বললেন না। একবার তাকালেন মিমির দিকে।

মিমি বললেন, 'তিথি ম্যাচিওর হয়নি এখনও। নইলে এমন হঠকারী কাজ কেউ করে!'

বিমলেন্দু নরম গলায় বললেন, 'তিথি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন তোরা কেন মেয়েটাকে যেতে দিলি? কেন পথ আগলে দাঁড়ালি না? বাড়ি ছেড়ে প্রথমে তো অন্য কোথাও যায়নি, গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়ি। তোরা কেন তখন অহেতুক জেদ ধরে থাকলি? কেন তিথিকে ফিরিয়ে আনলি না?'

নন্দিতা বলল, 'তিথি বুদ্ধিমান মেয়ে। আমি যখন আমার নিজের সমস্যা নিয়ে লড়ছিলাম তখন তিথিই আমাকে ভরসা জুগিয়েছিল। বলেছিল, খারাপ সময় কেটে যাবেই। বুঝিয়েছিল মেধা, পরিশ্রম, চিন্তা দিয়ে বিদ্যার যে চর্চা আমি করেছি তা সার্থক করে তোলার জন্য আমি দায়বদ্ধ।'

মিমি বললেন, 'তোরা ওকে বাইরে থেকে জানিস। পরিণতমনস্ক কোনও মেয়ে এমন ঝুঁকি নিতে পারে কখনও? ও আসলে ছোট থেকেই একটু অন্যরকম। সেজন্য আমরা ওকে প্যাম্পারও করেছি সাধ্যমতো। কিন্তু তাতে এখন মনে হয় হিতে বিপরীত হয়েছে। বখে গিয়েছে তিথি।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'তিথি কিন্তু স্টুডেন্ট খারাপ ছিল না। টানা ছ'বছর ধরে নাইনটি পারসেন্ট মার্কস স্কোর করেছিল স্কুলে। সেজন্য গোল্ড মেডেলও পেয়েছিল স্কুল থেকে। ভবিষ্যতে অনেক কিছু করবে এমন আশা আমাদের ছিল ওকে নিয়ে। কিন্তু ওই সুমন নামে ছেলেটার সঙ্গে মেশার পর থেকেই ওর পড়াশোনা থেকে মন সরে গেল। নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ করে দিল তিথি।'

মাধবী অনুযোগের স্বরে বললেন, 'স্কুলে পড়ার সময় দেখতাম মাঝে মাঝে মন খারাপ করে বসে থাকত বারান্দায়। কলেজে পড়ার সময় ছোট ছোট জিনিসেই কনফিউজড হতে শুরু করেছিল। অতিরিক্ত রাগ আর একাকিত্ব সে সময় ওর ডিমোটিভেটর হিসেবে কাজ করতে শুরু

করেছিল। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে তোমরা তিথির উপর নজর রাখোনি।'

মিমি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'কেন রাখব না দিদি, স্কুলে যখন পড়ত তখন থেকেই তিথির বন্ধু হতে আমি চেষ্টা করেছি। ওর বাবাও করেছে।'

নন্দিতা হাসল, 'আমার মনে হয় কারও স্বাভাবিক চরিত্র জোর করে বদলানো যায় না। যে অন্তর্মুখী সে তেমনটাই থাকবে। তাছাড়া ইনট্রোভার্ট হওয়াটা তো কোনও অপরাধ নয়। এক একজন মানুষ এক এক রকম হয়। তিথি তিথির মতো করে অন্যরকম।'

মাধবী বললেন, 'বছরে একবার করে দু'দিনের জন্য আসি। একটা জিনিস কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি। তিথি যখন কিন্ডারগার্টেনে বা স্কুলে পড়ত তখন থেকেই দেখেছি তোমরা ওকে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনা করছ। আমি দু'একবার বারণও করেছি তোমাদের।'

মিমি আর উৎপলেন্দু পরস্পরের দিকে তাকালেন। মিমি মৃদু গলায় বললেন, 'এখন থাক দিদি এসব প্রসঙ্গ।'

মাধবী বললেন, 'বলতে শুরু করেছি যখন তখন সবটুকুই বলি। আমার মনে হয় তিথিকে পর্যাপ্ত স্পেস দাওনি তোমরা। বড় হবার সময় প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটু পরিসর লাগে, যাতে সে নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে পারে। তিথি সে সুযোগ পায়নি ও নিজে কিছু একটা করে। সব সময় তোমাদের সিদ্ধান্ত ওর ওপর চাপিয়ে দিয়েছ।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তোরা ভেবেছিস যে চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক। এতেই ওর ভাল হবে। কিন্তু এতে যে বাচ্চাটার ওপর নিরন্তর চাপ তৈরি হয়েছে সেটা তোরা বুঝিসনি। সেজন্য অন্যের সঙ্গে তুলনা করার জন্য ওর মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে। একেই ও ইনট্রোভার্ট, ফলে ওর মধ্যে স্ববিরোধ তৈরি হয়েছে। কিন্তু কারও কাছে সেটা তিথি প্রকাশ করতে পারেনি। তোদের কাছেও না।'

মাধবী বললেন, 'এ ধরনের ক্ষেত্রে অন্য অ্যাভিনিউ থাকলে অ্যাগ্রেসন-টা চ্যানেলাইজ করে দেওয়া যায়। কিন্তু তিথি সেটার সুযোগ পায়নি। সে সময় সিমপ্যাথি দেখাতে হত, একটু স্পেস দিতে হত মেয়েটাকে, সুপারভাইজ করতে হত যত্ন নিয়ে। সেটা হয়নি বলেই ওর মধ্যে এসেছে ডিপ্রেসন। সেখান থেকেই এমন ঝুঁকির কাজ করেছে মেয়েটা।'

বিমলেন্দু বললেন, 'নন্দিতা যখন বিয়ের পর একটা মেন্টাল ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম একজন প্রফেশনাল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। উনি নন্দিতার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলেন ও ঠিক কতটা ক্লিনিকালি ডিপ্রেসড। সে অনুযায়ী ওর কাউন্সেলিং করেছিলেন, ওষুধ দিয়েছিলেন, ওর মনের চিকিৎসা করেছিলেন।'

বিমলেন্দু বললেন, 'এখন ইগো নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তিথির কাছে যেতে হবে তোমাদের। যে করেই হোক ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। বেচারি পাতাঝোরার মতো গ্রামে কেমন আছে কী করছে কে জানে! আমাদের কাল দুপুরের রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি ফিরে যাবার টিকিট কাটা আছে। সেটা তাহলে ক্যানসেল করে দিচ্ছি। পাতাঝোরায় যদি তোরা যেতে চাস তাহলে বল, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।'

উৎপলেন্দু একবার আড়চোখে মিমির দিকে তাকালেন। দু'জনের চোরা দৃষ্টি বিনিময় হল। মিমি চোখ মাটিতে রেখে কেটে কেটে বললেন, 'এখন আর সেটা হয় না দাদা। আপনার আর দিদির সব কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু শুধু ওই একটা কথা বাদ দিয়ে। পাতাঝোরায় আমরা কেউই যাব না। কিছুতেই না।'

২০

হামরা জলমাঙ্গারা আইসাই গে জলাইশরী
জল দিয়া করকেনি বিদায় গো জলাইশরী
হাসরা জলের তানে বেড়াই বাড়ি ঘরে গে জলাইশরী
জল দিয়া করকেলি বিদায় গে জলাইশরী।।

খালি গলায় দুলে দুলে গান গাইছিলেন মধুসূদন। চমৎকার গানের গলা তাঁর। হাত দিয়ে তাল দিতে দিতে ভরা গলায় একনাগাড়ে অনেকক্ষণ গান গাইবার পর থামলেন মধুসূদন।

সুমন আর তিথি একসঙ্গে বলে উঠল, 'বাহ্!'

মধুসূদন বললেন, 'রায়ডাক থেকে গঙ্গা, এর মধ্যে বিচিত্র, বিস্তীর্ণ যে ভূভাগ তাকেই আমরা বলি উত্তরবঙ্গ। লোকসংস্কৃতির এক অনন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এখানে। মালদার গম্ভীরা জারি সারি, মুর্শিদা-দিনাজপুরের খন বাউল নটুয়া, দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশের লাহাংকারী রাবণগান, জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া, মেচেনি, তিস্তাবুড়ির আর সত্যপীরের গান, চোরচুন্নি কিংবা পালাটিয়ার পাশাপাশি কোচবিহারের গোয়ালপাড়িয়া ভাওয়াইয়া কুষান দেহতত্ত্ব যাইটোন... লোকসংস্কৃতির এমন বৈচিত্র্য আর কোথায়!'

তিথি জানতে চাইল, 'যে গান আপনি গাইছিলেন সেটা উত্তরবঙ্গের কোন অঞ্চলের গান?

মধুসূদন বললেন, 'উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুরের কোচ-রাজবংশী, দেশিয়া, পলিয়া সমাজ গরমের সময় একটা বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করে। তার নাম জল মাঙ্গা ব্রত। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গরমে মাঠ ঘাঠ যখন ফুটিফাটা হয়ে যায় তখন তারা প্রকৃতিকে দেবী হিসেবে ভেবে এই গানটা গেয়ে থাকে।'

তিথি বলল, 'তিস্তার পাড়েও তো শুনেছি গ্রামের মহিলারা রাতের অন্ধকারে বেরোয় জলবাসনায়। পুজোর সময় নিজেদের নিরাবরণ করে সঁপে দেয় হুদুম দ্যাওয়ের কাছে জগৎ সংসারকে সরস করার প্রার্থনা নিয়ে।'

মধুসূদন সায় দিয়ে বললেন, 'হুদুম দ্যাওয়ের মাগন করতে বেরোয় তারা। কেউ কেউ একে বলে হুদমা উৎসব। পুরুষের এই উৎসবে প্রবেশ নিষেধ। সেই অনুষ্ঠানে হাল চাষের ভঙ্গি, মাছ ধরার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উর্বরা সঙ্গমের অভিনয় মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। তাই এসমস্ত গানে এই উর্বরা ভাবনার ছবি ধরা পড়ে।'

মধুসূদনকে বিস্মিত হয়ে দেখছিল তিথি। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ান মধুসূদন। কিন্তু লোকায়তধর্ম আর সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর জ্ঞান মানুষটার। ডুয়ার্স যেন মিশে আছে মধুসূদনের রক্তের মধ্যে। চোখ দু'টো একেবারে শিশুদের মতো সহজ, ভানহীন। ডুয়ার্সের প্রকৃতির কথা, মানুষের কথা বলার সময় তদ্গত হয়ে যান মধুসূদন।

সুমন বলল, 'কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কাছে সমস্ত নদীই কি দেবতা? প্রত্যেক নদী, তা সে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তা কোনও না কোনও দেবতার আবাসভূমি?'

মধুসূদন বললেন, 'নদী আর জল ঘিরে রয়েছে রিভার কাল্ট, ওয়াটার লোর। সেজন্যেই তিস্তাকে ঘিরে বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ির পুজো আর নাচ-গান চলে। এই নাচ-গান মেচেনি খেলা নামে পরিচিত।'

তিথি কৌতুহলী হয়ে বলল, 'আর তোর্সা নদী?'

মধুসূদন বললেন, 'তোর্সা নদী হল তোর্সা পীরের আবাসভূমি। ওদিকে গদাধর নদী আবার পূণ্যতোয়া গঙ্গার মতোই পবিত্র। তাই দেখবে শুক্লা অষ্টমীর অন্নপূর্ণা তিথিতে পিতৃতর্পণ ও অস্থি বিসর্জনের উদ্দেশ্যে কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষ এই নদীর তীরে ভিড় করে।'

সুমন হাসল, 'কামাখ্যাগুড়িতে শুনেছি জোড়াই নদীতে জোড়েয়াঠাকুর আর কুমারগ্রাম থানার শিববাড়ি রাধানগর এলাকায় নবনী নদী নবনীঠাকুর হিসেবে পুজো পেয়ে আসছেন যুগ যুগ ধরে। এই পুজোর প্রধান উপাচার আবার হাঁসের ডিম।'

তিথি জানতে চাইল, 'রাজবংশী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আমাদের এই পাতাঝোরার রাভা-কোচ জনগোষ্ঠীও কি নদীকে দেবতা হিসেবে মানে?'

মধুসূদন বললেন, 'মানে। সে কারণেই তো সংকোশ নদী কোচ আর রাভাদের কাছে 'আমাইজু' নামের দেবী। সাদা পাঁঠা উৎসর্গ করে তারা ফি বছর পুজো দেয়। কাজেই তিস্তা-তোর্সা নিয়ে বহু মিথ এদিকের কৌম সমাজের মধ্যে আজও প্রচলিত।'

তিথি বলল, 'এই জলসংস্কৃতিই নদী আর জলকে এদিকের মানুষের

‘গ্রাম সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। একটা সম্পূর্ণ অদেখা অজানা জগতের খোঁজ পেয়েছি এখানে এসে। পাতাঝোরায় না এলে এত কিছু আমি জানতেই পারতাম না।’

জীবনধর্মের অংশ করে রেখেছে। মিথ কথা আর কিংবদন্তী সংস্কৃতির অংশ হয়ে নদীগুলির মান্যতা বাড়িয়েছে।’

সুমন বলল, ‘কত শত মিথ ছড়িয়ে রয়েছে। তোর্সা নদীর দেবতা তোর্সা পীরের কথা শুনেছিলাম। তোর্সা পীরের সঙ্গে বিয়ে হল জলদাপাড়ায় খাউচাম মেচের মেয়ের সঙ্গে। তোর্সা নদীর দেবতা, পীরদেবতার আজও পুজো হয় ওসব দিকে। দাড়ি গোঁফঅলা এক অশ্বারোহীর মূর্তির কথাও শুনি।’

মধুসূদন বললেন, ‘মিথ কথার সূত্র ধরেই কোচ-রাজবংশী সমাজ নদী আর মানুষের সম্পর্কের প্রাচীন ধারাকে মনে করায়। নদী আর জল হয়ে ওঠে সংস্কৃতির আয়না। নদী সেখানে শুধুমাত্র স্রোতধারা নয়, নদী তখন মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার এক চিরায়ত ধর্ম।’

তিথি বলল, ‘আর কথার কচকচি নয়। আর একটা গান হোক দাদা।’

মধুসূদন হাসলেন, ‘বেশ গাইছি। রাজবংশী সমাজে তিস্তা নদীর স্বামী বুড়ো ধল্যা। ধল্যা ঠাকুর ‘বুড়াকর্তা’ নামে জলপাইগুড়ি আর তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত। প্রতি বছর বন্যার সময় তিস্তা আর তার ছেলে করলা নদী আর মেয়ে দুলালী দিঘির সঙ্গে মিলিত হয়। এই মেচেনি গানে রয়েছে তিস্তা নদীর চার বোন গুছিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, অঘনলক্ষ্মী আর পৌষলক্ষ্মীর কথা।

তিস্তাবুড়ি নামান গে হেইসে / বড়য় তো হাউসালি / হাউস করিয়া নেও গে / তিস্তাবুড়ির পনচ বাহিনী / গুছিলক্ষ্মীর নামান গে হইসে / বড়য় তো হাউসালি / ডাকলক্ষ্মীর নানান গে হইসে / বড়য় তো হাউসালি / অঘনলক্ষ্মীর নানান গে হইসে / বড়য় তো হাউসালি / পৌষলক্ষ্মীর নানান গে হইসে / বড়য় তো হাউসালি

মধুসূদন আবার তালি দিতে দিতে গান গাইতে শুরু করলেন। তাঁর দু’দিকে দুই মুগ্ধ শ্রোতা, তিথি আর সুমন। কিছুক্ষণ পর থামল গান।

তিথি জানতে চাইল, ‘পাতাঝোরা গ্রামে অনেক বাড়িতে দেখেছি তুলসীতলার পাশে ছোট ছোট দু’টো ঢিবি। মাটি অথবা শোলা দিয়ে তৈরি বিষহরির মূর্তি থাকে সেখানে। এই বিষহরি পুজো নিয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছে।

মধুসূদন বললেন, ‘রাজবংশী সমাজে বিষহরির প্রভাব গভীর। তাদের জন্ম মৃত্যু বিয়েতে তো বটেই, যে কোনও আপদে বিপদে বিষহরির উপাসনা হয়ে থাকে। আপনি যে ঢিবি দু’টোর কথা বলছিলেন, তার একটা হল বিষহরি। অন্যটা ধর্মঠাকুর। যা শিব হতে পারে, নারায়ণও হতে পারে।’

সুমন বলল, ‘লক্ষ করে দেখেছি মাটির মূর্তির বাহন যুগল হংস। দেবীর এক হাতে বরাভয় মুদ্রা, অন্য হাতে সাপ।

মধুসূদন বললেন, ‘শোলার মূর্তিতে থাকে চালচিত্র। সেখানে গাঙুরের জলে ভাসমান লখিন্দরের লব নিয়ে বসে থাকা বেহুলার ছবি আঁকা। একদম নিচে বিষহরির সখী ‘নেতা’-র ছবি থাকে। মাঝখানে থাকে বিষহরির মূর্তি। এই বিষহরির নাম পদ্মা বিষহরি কিংবা কানা বিষহরি। শ্রাবণ মাসের শেষে, সংক্রান্তিতে আর গোটা ভাদ্রমাস জুড়ে পাতাঝোরার ঘরে ঘরে পুজো হয় বিষহরি মায়ের। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনি অবলম্বনে ‘মুখাবাঁশি’ দিয়ে গাওয়া হয় বিষহরির গান। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে বিরাট মেলাও বসে।’

সন্ধে ঘনিয়েছে পাতাঝোরায়। মধুসূদনের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেল অনেকটা।

ঝুঁকরো আঁধার নেমে এসেছে। তার মধ্যে ছায়া ছায়া পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে বাড়ি ফিরছিল সুমন আর তিথি। তিথি গাঢ় স্বরে বলল, ‘গ্রাম সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। একটা সম্পূর্ণ অদেখা অজানা জগতের খোঁজ পেয়েছি এখানে এসে। পাতাঝোরায় না এলে এত কিছু আমি জানতেই পারতাম না।’

সুমন একটু হেসে বলল, ‘কালীদাসের সেই বহুচর্চিত শ্লোকটা জানো তো? সেই যে দুরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী তমালতালি বনরাজি নীলা / আভাতি বেলা লবনাম্বুরাধারা নিবন্ধের কলঙ্করেখা। এর অর্থ জানো?’

তিথি বলল, ‘জানি। অতল অপার সমুদ্রের গভীরে কত মণিমানিক। তার কতটুকুর সন্ধান আর আমরা পেতে পারি এক জীবনে।’

একটুক্ষণ চুপচাপ। তিথি হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার একটা কথা রাখবে?

সুমন বলল, ‘কী কথা?’

তিথি বলল, ‘এটা ভাদ্র মাস চলছে। এই মাসে একদিন বাড়িতে বিষহরি মায়ের পুজোর ব্যবস্থা করবে?’

সুমন ভুরু জড়ো করে বলল, ‘এতকিছু থাকতে হঠাৎ বিষহরি পুজো দিতে যাব কেন?’

তিথি আনমনা স্বরে বলল, ‘সেদিন সাপের স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই মনটা কেমন যেন করছে। ভাল লাগছে না কিছু। বিষহরির পুজো দিলে মনের অস্বস্তিটা হয়ত একটু কাটবে।’

সুমন তিথির হাতে আঙুল নিজের হাতে নিয়ে স্মিতমুখে বলল, ‘বেশ তাই হবে।’

তিথি একটু দ্বিধা করে বলল, ‘বিষহরি পুজো করার চল রাজবংশী সমাজের। আমাদের বাড়িতে বিষহরির পুজো করলে মা কিছু মনে করবেন না তো?’

সুমন বলল, ‘আমার মায়ের মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো মা একটুও আপত্তি করবে না।’

২১

একদিকে করলা, অন্যদিকে তিস্তা দুই প্রলয়মত্ত নদী এক হয়ে মিশে প্রবল দ্রুতিতে ধাবমান হয়েছে গন্তব্যের দিকে। মাঝখানে বেশ খানিকটা সবুজ। প্রচুর গাছপালা। তার মধ্যে একটা বুড়ো পাকুড়গাছ রয়েছে। সেই গাছটা মাথা তুলে যত আকাশ ছুঁতে চাইছে, তার ঝুরিগুলি তত মাটি থেকে রস সঞ্চারের আশ্বাস দিচ্ছে। জায়গাটা যেন সবুজ মরকতমণিতে তৈরি উলটে রাখা একটা জামবাটি।

নির্ভীক কাঠবেড়ালির দল ওঠা-নামা করছে গাছ জুড়ে। সার্কাসের ট্র্যাপিজের জলের মতো ঝুরিজুলি ঝুলে রয়েছে। ক’দিন ধরে বর্ষার জলে স্নান করেছে গাছপালা। ধুলোবালিহীন সবুজের ছটায় উপচে উঠছে চারদিক গাছগাছালির শাখাপ্রশাখায় শয়ে শয়ে প্রাণের আশ্রয়। টিয়া, চন্দনা, মৌটুসি, দোয়েল, কোয়েলের কলকাকলিতে মুখরিত হচ্ছে মেঘলা বিকেল।

ক’দিন ধরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে ডুয়ার্সে। প্রত্যেকটা নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তিস্তা আর করলাও জলে টইটম্বুর। আজও সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা তবে বৃষ্টি শুরু হয়নি এখনও। স্টেশনবাজারে সবজি বিক্রি করে প্রশান্ত, তার বাড়ি এখানে। সবজি কিনতে এসে প্রশান্তর সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ হয় আকাশের। প্রশান্তর কাছ থেকে এই জায়গাটার কথা শুনে আজ দল বেঁধে এখানে এসেছে সকলে।

অলিভিয়া একটা বড় বোল্ডারের ওপর বসে পাকুড়গাছে ঠেস দিয়ে দিয়ার উদ্দেশে বলল, ‘একটা কথা তোর কাছে জানতে চাইব চাইব করে এতদিন জানা হয়নি। আচ্ছা তুই সেন্ট জেভিয়ার্সে বায়োটেকনোলজি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলি কী মনে করে?’

দিয়া হাসল, বর্ধমান কিংবা কল্যাণী ইউনিভার্সিটির অনেক কলেজেই গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে বায়োটেকনোলজি পড়ানো হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেও পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি কোর্স আছে। নম্বরের বেসিসে মেরিট লিস্ট অনুযায়ী এখানে চান্স পেয়ে গিয়েছিলাম বলেই ভর্তি হয়েছিলাম।

নীল বলল, 'তোর কি স্কুললাইফ থেকেই বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়ার অ্যামবিশন ছিল?'

দিয়া বলল, 'স্কুলে আমি লাইফ সায়েন্সে বরাবর ভালো মার্কস পেয়েছি। তবুও বলব, ভাল রেজাল্টের সঙ্গে এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ার ইচ্ছেটাকে বিচার করাটা ঠিক হবে না। বায়োটেকনোলজি নিয়ে যে পড়তে যাবে তাকে এই বিষয়টাকে ভালবাসতে হবে।'

আকাশ হেসে বলল, 'বিষয়টাকে না জেনে বা না পড়ে সেটাকে ভালবাসব কী করে?'

দিয়া বলল, 'উত্তরটা খুব সহজ। চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে আমরা সকলেই একটু-আধটু খবর রাখি। এই যে ধর কিছুদিন আগেই ইবোলা ভাইরাস নিয়ে উত্তাল ছিল সারা দুনিয়া সেটা নিশ্চয় জানিস।'

আকাশ মাথা নাড়ল, 'জানি। শুধু ইবোলা কেন আরও অনেক দুরারোগ্য রোগই তো মাঝেমাঝে খবরের শিরোনামে চলে আসে।'

দিয়া হাসল, একজ্যাক্টলি। সেগুলো কেন হয়, কীভাবেইবা এই রোগের নিরাময় সম্ভব সেটা ভেবে রাতের ঘুম উবে যায় অনেকের। কিংবা ধর এই যে বিশ্বে জ্বালানি ভাণ্ডার কমে আসছে। ভবিষ্যতে পেট্রোলের বিকল্প জ্বালানির কথা আমাদের ভাবতে হবে।'

নীল বলল, 'কাগজে পড়েছি সেটা নিয়ে কাজকর্ম ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।'

দিয়া সায় দিল, 'ভবিষ্যতে আরও হবে। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হল এসব জিনিস নিয়ে ভাবে কারা? এমন ধরনের প্রশ্ন কাদের মনে জড়ো হয়? আমার কিন্তু হত ছোটবেলা থেকেই। স্কুলে থাকতেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতাম মনে মনে। বায়োটেকনোলজিই হল সেই বিষয় যেটা নিয়ে এই উত্তরগুলোর কাছে পৌঁছনো যায়।'

আকাশ উৎসুক গলায় বলল, 'বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়ে কী ধরনের কাজ করা যায়?'

দিয়া বলল, 'আমাদের দেশে এই ইন্ডাস্ট্রি এখনও তেমন বড় হয়ে ওঠেনি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাড়বে। এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে বায়োটেকনোলজির ছেলেমেয়েরা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল, ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যাকোয়াকালচার কিংবা এগ্রিকালচারাল ফিল্ডেও জব প্রসপেক্ট আছে।'

অলিভিয়া মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'উফ তোরা থামলি! পড়াশোনা নিয়ে কথা শুনলে আমার মাথাব্যথা হয়ে যায়। এসব কথা ছাড় তো তোরা।'

দিয়া খিলখিল হাসল, 'আমিও ব্যাপক বোর হচ্ছি। লেটস চেঞ্জ দ্য টপিক।'

অলিভিয়া হাসল, 'আমি ক'দিন ধরেই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি জানিস। কাল রাতেও দেখলাম ডানা মেলে পাখির মতো উড়ছি আকাশে। এই স্বপ্নটা এ নিয়ে দু-তিনবার দেখলাম।'

নীল চোখ মটকাল, 'শুধু স্বপ্নে কেন তুই আর সাগ্নিক তো শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাস্তবিকই উড়ছিস। তুই এনগেজড হয়ে গিয়েছিস দেখে কত ছেলের যে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে খবর রাখিস?'

অলিভিয়া ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে পিস্তল বানিয়ে নীলের দিকে তাক করে বলল, 'ফাজলামি হচ্ছে তাই না! এবার কিন্তু গুলি করে তোর খুলি উড়িয়ে দেব বলে দিলাম।'

আকাশ হাসছিল। এবার হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হয়েছে। বলল, 'মানুষের জীবনে স্পষ্ট দু'টো ভাগ রয়েছে। এক হল জাগ্রত জীবন। অন্যটা স্বপ্নের জীবন। প্রশ্ন জাগে স্বাভাবিকভাবেই যে জাগ্রত জীবন যদি বাস্তব হয় স্বপ্নের জীবন তাহলে কী? ফ্রয়েডের মতো কিছু মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্ন নিয়ে বই-টই লিখেছেন ঠিকই কিন্তু সেভাবে কোনও ব্যাখ্যা কিন্তু এর নেই।'

অলিভিয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। আসলে জেগে ওঠার পর স্বপ্নের কথা বিস্তারিতভাবে কেউ কেউ মনে রাখতে পারে। বেশিরভাগই পারে না। আসলে জেগে ওঠার পর স্বপ্ন কিছুক্ষণ জ্বলজ্বল করে, তারপর মিলিয়ে যায় একসময়। কাচের উপর যদি জল দিয়ে একটা দাগ আঁকা যায় সেটা যেভাবে মিলিয়ে যায় ঠিক সেভাবে।'

আকাশ বলল, 'তুই যখন ছোট ছিলি তখন কি বাবা, কাকা, মামাদের কাঁধে চেপে খুব ঘুরে বেড়াতিস?'

অলিভিয়া বলল, 'হ্যাঁ যেমন করে সব বাচ্চারা ঘোরে তেমন করে আমিও ঘুরেছি। তবে বাবা কাকা মামা নয় আমাকে নিয়ে ঘুরত দাদাই। আমাকে দু'হাতে মাথার উপর তুলে উপরে ছুঁড়ে আবার ধরে নিত দাদাই। কখনও আবার শুয়ে শুয়ে দু'হাঁটুর উপর আমাকে তুলে শূন্যে তুলত আর নামাত। আমি দারুণ মজা পেতাম। দাদাইকে বারবার ওই খেলাটা খেলতে বলতাম।'

দিয়া বলল, 'তোর দাদাই তো আর নেই তাই না?'

অলিভিয়া ছলছলে চোখে মাথা নাড়ল, 'দাদাই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে কয়েক বছর হয়ে গেল। খুব মিস করি রে দাদাইকে।'

আকাশ বলল, 'তোর স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। তোর ছেলেবেলার ওই আনন্দের স্মৃতিগুলো তোর মনের অবচেতনে রয়ে গিয়েছে। শৈশবের তুই ওই বিশেষ খেলাটার সময় মনে মনে পাখি হয়ে যেতিস। সেই স্মৃতিই তোর স্বপ্নের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছে। তুই মনে মনে সেই ছোটবেলার খুশির দিনগুলোয় ফিরে যেতে চাইছিস বলেই পাখি হয়ে ওড়ার স্বপ্নটা দেখছিস।'

অলিভিয়া প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, 'অ্যাই জানিস কাল সন্ধেবেলা কসমস আর্কেডে গিয়েছিলাম। তুলিমামির সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল। টুকিটাকি কেনাকাটা করতে এসেছিল কসমসে। শুনলাম তিথি এর মধ্যে একদিন নাকি ফোন করেছিল তুলিমামিকে।'

দিয়া উদগ্রীব গলায় বলল, 'কেমন আছে রে তিথি?'

অলিভিয়া বলল, 'এমনিতে ভালই আছে, দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে পাতাঝোরায় গিয়ে। তবে কিছুদিন আগে তিথি ভোররাতে কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে একটু আপসেট হয়ে পড়েছিল। পরদিন সকালেই তুলিমামিকে ফোন করেছিল তিথি।'

দিয়া বলল, 'বহুদিন ধরেই ভাবছি পাতাঝোরায় একবার যাব কিন্তু কিছুতেই প্ল্যানটা মেটেরিয়ালাইজ করছে না। কোনও এক শনিবার গিয়ে রোববার ফিরে আসতেই পারি আমরা। মোটে দু'দিনের তো ব্যাপার।'

নীল বলল, 'এটা তুই ঠিক বলছিস দিয়া। এই তো আমরা বর্ষার মধ্যে স্নেকলিলি আর লাল অর্কিড দেখব বলে সিকিম ঘুরে এলাম প্রাণ হাতে করে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল পাতাঝোরায় গিয়ে তিথির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলাম না।'

আকাশ বলল, 'শুভস্য শীঘ্রম, নেকস্ট উইকেন্ডেই একদিন পাতাঝোরা গিয়ে তিথির সঙ্গে দেখা করে আসি চল।'

অলিভিয়া ডানহাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে হাসল, 'ডান। তবে তাই হোক।'

নীল বলল, 'তিথিকে আগে থেকে কিচ্ছু বলা চলবে না। ওকে জব্বর সারপ্রাইজ দিতে হবে যাতে আমাদের আচমকা দেখে ওর চোখ কপালে উঠে যায়!'

দিয়া একগাল হেসে বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। আগে থেকে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। একবারে পাতাঝোরায় তিথিদের বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে ওকে আগাপাশতলা চমকে দেব আমরা।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

অঙ্কন: সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

তিস্তা

জীবন সরকার

জয় হাসতে হাসতে বলল, 'আমি এসেছি।'
রেজা করিম দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কই গেছিলে? একদম বেপাত্তা।'

জয় উত্তর দিল, 'কাজে বাইরে ছিলাম।'

—শরীর খারাপ লাগছে কেন?

—না না ঠিক আছে। জয়কে দেখে তিস্তা এগিয়ে এল, কোথায় গিয়েছিলে?

—মাসিরা চিন্তা করছে। একবার বলে গেলে কী হয়?

—কাকে বলে যাব?

—তার মানে, তোমার কেউ নেই?

—কে আছে?

—আমরা আছি। আমরা বুঝি তোমার কেউ নয়? জয় কোনও কথা বলছে না দেখে বলল—উৎসব শেষ হলে বাড়ি আসবে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—কী কথা, কোনও কথা নেই।

—কী বললি? চল, মাসিদের সামনে বলবি। তুই তো লায়েক হয়ে গিয়েছিস দেখছি! আমাদের ভুলেই গিয়েছিস। কোথায় যাস কোথায় থাকিস, কিছুই তো জানতে পারি না।

জয় তিস্তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কোনও কথাই বলছে না। বলার তো কিছুই নেই।

তিস্তা একটু রেগেই বলল, 'আমি তোকে একটা কথা বলেছি কানে গিয়েছে?'

—আমার খবর নেয় কে? মরে গিয়েছি না বেঁচে আছি কেউ কি খবর নেয়?

—খবর দিলে তো খবর হবে। তুই বাড়িতে আসিস, তোর সঙ্গে কথা আছে। সহজিয়ার খবর কী?

জয় ঘাড়টা ঘুরিয়ে ফোঁস করে উঠল জাতসাপের মতো, 'আমি কী জানি, তোর বন্ধুর খবর তো তুই রাখবি।'

—তোর বন্ধু নয়?

—জানিস তো। আমার মনে হয় তুই সেটা ভুলে গেছিস।

—আমি কিছু ভুলিনি। আমার সব কিছু মনে থাকে।

—ছাই থাকে। তুই বল তো সহজিয়া স্টেশন থেকে ফিরে গেল এটা কি ঠিক হয়েছে?

—আমাকে না জিজ্ঞেস করে ওকেই জিজ্ঞেস কর ফোন তো আছে।

—তুই জানিস না?

—তোর বন্ধু আমি জানব কী করে?

—তোর বন্ধু, তোর বন্ধু করবি না তো। এক কথা বারবার ভাল লাগে না।

—তুই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলি।

—সেটাই তো কাল হয়েছে। মানুষের ভাল করতে নেই। তোর জ্বর হল। হাসপাতালে সহজিয়াই ভর্তি করে দিল। রোজ তোকে দেখতে যেত। আর তুই কিনা সেই সুযোগ নিলি। আমার কথা একবারও ভাবলি না। মাসিদের কথাও মনে হল না।

—আমি কী করেছি?

—কী করেছি? মুখ নেড়ে কথা বলছিস? তোর লজ্জা করে না? আর তোকে তো বলে লাভ নেই। সহজিয়া ভাল মেয়ে, সেই সুযোগ নিয়ে হাত বাড়ালি! ছিঃ ছিঃ আমাদের মুখ রাখলি না। মাসিদের কথা একবারও চিন্তা করলি না। তুই আবার কথা বলছিস, লজ্জা করে না তোর? যারা এতদিন ধরে দেখল, ভালবাসল, কলকাতার রসগোল্লা পেয়ে ভুলে গেলি। তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।

—কী বললি? খবরদার আজেবাজে কথা বলবি না।

—তুই কী করবি? হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব কিন্তু। আমাকে চিনিস না তুই। ভালর ভাল, খারাপের খারাপ। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। আসবি কিন্তু।

—ঠিক আছে। আমি কিছু ভুলি না। আমার সব মনে আছে। কে কী বলেছে কে কী করেছে আমার সব মনে আছে, আমি বেইমান নই।

কার্তিক ছুটে এসে বলল, 'জয় তুই এখানে গল্প করছিস, আর ওদিকে তোকে ডাকাডাকি করছে। আজকে এত বড় অনুষ্ঠান তুই গান করবি তোর একটা দায়িত্ব নেই?'

—যাচ্ছি। আসলে আমার শরীরটা ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—পরে বলব।

মেয়েরা তখনও গাইছে 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' সেই গানের সুরে তাল মিলিয়ে ব্যান্ড বাজছে। অতিথিরা সব স্টেজে। শ্যাম, কার্তিক, বাচ্চু ওরা সবাইকে জল দিচ্ছে। এইবার নাচবে তহমিনার সঙ্গে স্কুলের ছাত্রীরা। তহমিনা গাইছে, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'...। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন গান, তারা সেই গান গাইছে। ওদিকে নাচের পর আবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। কথার ফুলঝুরি চলছে। রেজা করিম ছুটছে। তিস্তাও কম যায় না, তদারকি করছে ছেলে-মেয়েদের। এর পরেই আলুর দম, লুচি, লাড্ডু এসে যাবে। এইসব দায়িত্ব রোশেনারার। মঞ্চের পাশেই জাতীয় পতাকা উড়ছে। পাশে সাদা নীল লাল পতাকা উড়ছে। এইভাবেই সাজিয়েছে রোশেনারা লোক লাগিয়ে। জ্যেৎস্না সুব্বা, আই পি ঘোষবাবু, নূরজাহান, ভুটানের কিছু নামকরা মানুষ এসেছেন, রেজা করিম তো আছেই।

—চলে এসেছে, চলে এসেছে। তোমরা সব লাইন দিয়ে দাঁড়াও। শালপাতা দিচ্ছি। বাচ্চারা সব গোল হয়ে বসে আছে। কার্তিক শালপাতা দিতে লাগল পিছনে থিরুমল ও আরও কয়েকজন লুচি আলুরদম নিয়ে তার পিছনে লাড্ডু নিয়ে বঙ্কু সাহা। কিছু টাকা দিয়েছে বানারহাটের ইস্টবেঙ্গল স্টোর্স, রতন সিং-এর স'মিল, সেই সুদূর পঞ্জাব থেকে এখানে স'মিল দিয়েছে। বানারহাটের ডাঃ পার্থ কিছু টাকা দিয়েছে চা-এর জন্য।

ঢাকাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে হারাধন কিছু টাকা দিয়েছে। বাগান থেকে চামুর্চি বাজার থেকে কিছু টাকা এসেছে। চারদিক থেকে বেশ কিছু টাকা আসে। তারপর ক্লাবগুলি আছে। মন্দির ফান্ড, মসজিদ ফান্ড, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ও গির্জা থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। তারপর তো ব্যবসায়ী সমিতি আছেই। সব শেষে রেজা করিম।

আবার জয় ফিরে এসেছে। ম্যান্ডোলিন আর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গাইছে, 'বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে, আয়না যা না গান শুনিয়ে...' জয় নাচছে আর গান গাইছে। সব বাচ্চারা ওকে ঘিরে ধরেছে। তারপরেই আর একটা গান ধরল, 'বসন্ত এসে গেছে'।

তিস্তা, তসমিনা, তহমিনাও এসেছে। জয়কে দেখছে। জয়-এর মাথায় ঝাঁকড়া ময়লা চুল, মুখে দাড়ি অনেকটা যিশুখ্রিস্টের মতো লাগছে। কে বলবে ওর শরীর খারাপ। এখানে এসে যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অতিথিরা যারা এসেছিল তাদের বিদায় জানাবার জন্য রেজা করিম ব্যস্ত। তিস্তা খুঁজছে জয়কে, কিন্তু পাচ্ছে না। তসমিনা বলল, 'জয়কে কী সুন্দর দেখতে হয়েছে।' তিস্তা টিয়াপাখির মতো মাথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'তোর বুঝি খুব পছন্দ?'

তহমিনা টিপে হাসছে। দুই বোন হলে কী হবে গলায় গলায় ভাব।

—কেন রে ভালকে ভাল বলব না। এটা ঠিক গানের গলাটা ভাল। স্বীকার করতেই হবে।

—কে না করেছে। তুই যেভাবে জিজ্ঞেস করলি তাতে কী বোঝায়?

—আমি কিছু মনে করে বলিনি। আমরা তো ওর সঙ্গে মিশি না। সেইজন্যই বললাম। রাগ করছিস কেন সখি। কথাটা বুঝি বুকে লাগল। বুঝি আমরা সব বুঝি। চোখ বলছে তুই কাউকে খুঁজছিস, কাকে খুঁজছিস? বলত সত্যি করে বল, কার জন্যে এত উতলা তুই?

তিস্তা একটু হেসে বলল, 'যা ভাগ। রাগাবি না কিন্তু। এই তোরা লুচি খেয়েছিস?'

—ঠিক আছে। এতক্ষণ পর মনে পড়ল! সখি গো তোমার লাগিয়া। কানু বিনে রাই। কান্দিয়া কান্দিয়া রাধা কাহিল। কি জাতনা বিষে। ভালবাসা কারে কয়।

—ভাল হবে না বলছি। বাইরে থেকে মনে হয় তোরা কিছুই জানিস না বুঝিস না, এখন দেখছি তোদের মুখে ভালবাসার খই ফুটছে। কী এমন ঘটল। তোদের মনে দোলা লেগেছে।

তহমিনা নাচের ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'ঢঙ, ন্যাকা তুই কি কিছুই বুঝতে পারছিস না? জানি। আমরা সব জানি। চালাও পানসি। ভাল, ভাল।'

—সব ভাল যার শেষ ভাল। এই আবার কবে দেখা হচ্ছে?

তিস্তা একটু স্বাভাবিক হয়ে উত্তর দিল, 'শাদিতে।'

তসমিনা, তহমিনা দু'জনেই একসঙ্গে বলল, 'ধ্যাৎ।' ধ্যাৎ বলেই ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

মা, রোশেনারা আগেই চলে গিয়েছে। সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে এতক্ষণ যে ছিল সেটাই বড় কথা। আব্বা তো সংসারের কাজকর্মের কিছুই খবর রাখে না বাইরের কাজকর্ম নিয়েই থাকে। আম্মাকেই সবকিছু সামলাতে হয়। এত বড় বাড়িটা ঠিকঠাক করে রাখা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। অবশ্য বাড়িতে কাজ করার লোকজন আছে। থাকলে কি একজনকে তো কাজগুলো করাতে হয়। ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না। চোখে চোখে রাখতে হয়।

তহমিনা, তসমিনা যাচ্ছে। দুই বোনের মধ্যে ভীষণ ভাব যা দেখে তিস্তার খুব ভাল লাগে। ওরা মাকে কাজে সাহায্য করে, তারপর যেটুকু সময় থাকে সেটা পড়াশোনা বা গানবাজনার জন্য। ওদের দু'জনকেই দেখতে ভাল। পাত্র পেতে খুব অসুবিধা হবে না। ওদের জন্য পাত্র তো চোখে পড়ছে না। তবে এখনকার জেলা সভাধিপতি ওদের আত্মীয়, সে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। বাবার তো চেনাজানার পরিধি কম নয়, কোনও অসুবিধা হবে না।

জয়কে কোথাও দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিস্তা বাড়ির দিকে এগোল। নিশ্চয়ই আবার কোথাও গিয়েছে। কলকাতা থেকে আসার পর থেকেই দেখছি জয়ের কেমন উড়ু উড়ু ভাব। সহজিয়া ওকে কী মন্ত্র দিয়েছে কে জানে। সহজিয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কীরকম জানতেই হবে। এটা ঠিক সহজিয়ার সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় না থাকলে এই কথা ভাবতই না। জয় তো কারও চেয়ে কম নয়। সবদিক থেকে চৌখস। হাতের কাছে এইরকম একজন যুবক অন্য ঘরে চলে যাবে তা হয় না। ওর সঙ্গে ভাবা উচিত ছিল। সহজিয়াই এই ভাবনাটা মাথায় ঢোকাল। কিন্তু সব কিছু দেরী হয়ে গেল না তো, কে জানে সেটাই জানতে হবে। সেই গোপন কথাটা বলতেই পারছে না কিংবা এও হতে পারে ধরা দিচ্ছে না। কোনও এক সময় মাসিদের বাড়িতে থাকত। যত রাজ্যের আবদার মাসিদের সঙ্গেই কোনও কিছু খেতে চাইলে মাসিদের কাছে বলত। মাসিরাও ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। পরের ছেলে বলে ভাবেনি। হাতের কাছে থাকলেও ওই কথাটা কখনওই মনে হয়নি। অন্যরকমভাবে ওকে দেখত। সহজিয়াই সেই কথাটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কলকাতায় যাওয়ার পর আরও বেশি করে সেই ভালবাসার মৌমাছি পাখনা ছড়াল। এখন তো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সহজিয়ার সঙ্গে কতটা পথ হেঁটেছে কে জানে। জানতেই হবে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তিস্তা কখন যে বাড়ির দরজায় এসে গিয়েছে খেয়াল নেই। ঘরে ঢুকে তো অবাক। জয় মাসিদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই আগের মতোই। চারদিকে যাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান সে কিনা নিজের ঘরেই। একেই বলে পরম পাওয়া। হাতের মুঠোয় চাঁদ। চাঁদ এত কাছে ভগবান তুমি সত্যি আছো। ওই যে বলে না যাকে মনে মনে চাওয়া যায় ভাবা যায়, তা যদি সত্যি হয় ভগবান তাকে এইভাবেই বুঝি মিলিয়ে দেয়। তিস্তা ভীষণ খুশি এখন। বৈশাখ মাসেই এই ঘটনা ঘটল। তা হলে নিশ্চয়ই সারা বছরটা ভালই যাবে। তার মানে জয় চামুর্চিতেই থাকবে। কোথাও যাবে না। দেখা যাক। কপাল তো ভাল নয়। মানুষ যা ভাবে তা কি সব সময় সত্যি হয়, হয় না। আগামীতে কী হবে তা আগামী দিনগুলিই বলবে।

তিস্তা নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলল, 'তুই কোথায় ছিলি? তোকে যে আমি কত খুঁজছি। আমার সঙ্গে একটা কথা বলে আসা যেত না? তোর পাখনা গজিয়েছে। আমি দেখছি, শুধু দেখে যাচ্ছি। দেব না একদিন টের পাবি। সহজিয়া রক্ষা করতে পারবে না।

জয় রেগে গিয়ে বলল, 'খুঁজছিস কেন?'

—দেখলাম তুই তো সাংঘাতিক ব্যস্ত। গান গাইছিস, নাচছিস। তোর র‍্যালাই আলাদা। তোকে তো চেনা যাচ্ছিল না। আমাকে তো চিনতেই চাইলি না।

—কী বলছিস! এত বড় একটা অনুষ্ঠান তোর ধারণা আছে? কত লোক, কতগুলো স্কুল এসেছে তা তো খেয়াল আছে। দূর থেকে বক মারছিস। কাছে আসতে পারিস না?

—তোর কিন্তু ল্যাজ গজিয়েছে। ল্যাজে আগুন লাগিয়ে দেব। দমকল কিছু করতে পারবে না।

—তাহলে তো ভালই হয় সবাই একসঙ্গে ছাই হয়ে যাব। বেশ ভাল। মরতে আমি ভয় করি না।

—আমারও নেই।

—ঠিক আছে। এখন বল কেন খুঁজছিলি।

—আয়, আমার কাছে আয়। মাসিরা নেই বাজারে গিয়েছে, আয়।

—কেন, শুনতে পাচ্ছি বল না।

—অত দূর থেকে বলা যাবে না কাছে আয়। বলেই তিস্তা জয়কে হাত ধরে টেনে কাছে বসাল। বলল—আমাকে তোর ভাল লাগে না? সহজিয়া কি আমার চেয়ে সুন্দর?

জয় হতভম্ব! কী বলছে তিস্তা! পাগল হয়ে গেল নাকি! আমি তো কোনওদিন ওই চোখে দেখিনি। কী করছে তিস্তা। মনে মনে ভাবছে কিন্তু তিস্তাকে সরাতে পারছে না। জয়কে আরও কাছে টেনে ওর ওপর শুয়ে পড়ে গিয়ে নিজের মুখটা জয়ের ঠোঁটের ওপর রাখল। জয় নিজেকে কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারছে না। ভাবতেও পারছে না কিচ্ছু। জয়ের শরীর কাঁপছে। তিস্তাকে মনিবের মেয়ে বলে দূরে সরিয়ে রাখছে। তিস্তার আজকের এই ঘটনায় বোঝা গেল সে তিস্তার হাতের পুতুল হয়ে গেল। ও যা করছে বাধা দিতে চাইলেও বাধা দিতে পারছে না। ওর শরীরের আকর্ষণ পাগল করে দিয়েছে জয়কে। বিচার বুদ্ধি সব যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। জয় একটা ঘোরের মধ্যে যেন রয়েছে। এর আগে তো কোনও মেয়েই এইভাবে ওর জীবনে আসেনি। ওর কাছে এই ঘটনা মারাত্মক। ওর সমস্ত শরীরে অন্য রকম কী যেন একটা খেলা করছে। তিস্তাকে সরিয়ে দিতে পারছে না। তিস্তার ঠোঁট ওর ঠোঁটে, বুকের ওপর তিস্তার বুক ওঠানামা করছে, কেউ কাউকে ছাড়াতে পারছে না। দরজা খোলা রয়েছে সে খেয়ালও নেই। দু'জনেই দু'জনের শরীরে ঢুকে যেতে চাইল। তিস্তা যেন রাক্ষসীর মতো জয়কে ছিঁড়ে খেতে চাইছে। জয় তিস্তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। তিস্তা যা কিছু করছে বাধা দিতে পারছে না। ওরা যেন আর এই পৃথিবীতে নেই। চলে গিয়েছে অন্য পৃথিবীতে। জয়ও আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। তিস্তার বুকে মুখ রেখে পাগলের মতো করতে লাগল। তিস্তাও সমানে ওকে আরও জড়িয়ে ধরল। এখন ওরা এই জগতে নেই। কতক্ষণ যে এইভাবে ওরা দু'জনে দু'জনকে জাপটে ধরে ছিল তা ওরা জানে না। জানার কথাও নয়।

এই সময় মাসিরা ঘরের বাইরে থেকে ডাকল, তিস্তা, তিস্তা কে এসেছে রে? মাসির গলা পেয়ে তিস্তা তাড়াতাড়ি জয়কে ঠেলে সরিয়ে দিল। জয় কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে খাটের এক কোণায় মাথা নীচু করে বসে রইল। তিস্তা নিজের কাপড়টা ঠিক করে বলল, 'যাই মাসি। দরজা খোলাই আছে। হাওয়াতে বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' মাসিরা ঘরে ঢুকেই বলল, 'জয় কখন এল?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে।

জয়কে বলল, 'তোর তো দেশ নেই। এইখানে ছিলিস। কোথায় গেছিলি? শরীর ভাল আছে তো?

—না। হ্যাঁ, আছে। কিছু হয়নি।

—তবে আসিস নাই ক্যান? কী হয়েছে তোর? এত তাড়াতাড়ি আমাদের ভুলে গেলি?

জয় কোনও কথা বলছে না। ওর শরীর এখনও থর থর করে কাঁপছে। নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছে না। মুখ উঁচু করে মাসিদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েও যেতে পারছে না। সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটে গেল। যা কিনা কোনওদিন চিন্তাই করতে পারেনি। মনের মধ্যে কোনওদিন ঠাঁই দেয়নি। সেই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। তিস্তা নিজের কাপড় ঠিক করতে করতে নিজেও ভাবতে পারছে না কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটে গেল। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারল না। মাসিরা যদি বুঝে যায় তাহলে কী হবে। তবে এটাও বুঝতে পারল যে, সহজিয়ার সঙ্গে জয়ের আজকের এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। ঘটে থাকলে ও নিজেকে এইভাবে মেলে ধরতে পারত না বাধা দিতই। তিস্তার যদিও ভয় করছে এই ঘটনা কতদূর পৌঁছবে কে জানে। মাসিরা জানলে কীভাবে নেবে কে জানে। নিজেই তো চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। চট করে বলল জয়কে, 'কী যেন বললি, তুই এখন যা, কাল আবার আসিস।'

বাঁধা গরুকে ছাড়লে যে অবস্থা হয়, সেইরকম ভাবে জয় ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাসিরা বলল, 'জয় চা না খেয়েই চলে গেল, কেন, কী হয়েছে?'

তিস্তা মুখ নীচু করে উত্তর দিল, 'আমি কী জানি। কাজ আছে, কাল আবার আসবে।'

মাসিরা বলল, 'সে কি? চা না খেয়ে তো যায় না। তুই কিছু বলিস নি তো? তুই কিন্তু ওকে কিচ্ছু বলবি না। ও আমাদের অনেক উপকার করে।'

—না, কিচ্ছু বলি নি।

—তবে ওইভাবে চলে গেল কেন? কিছু একটা না হলে তো ও এইভাবে যায় না। ভাল কথা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান কেমন হল?

—ভাল।

—জয় গান গেয়েছে?

—হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করিস নি কোথায় গিয়েছিল?

—না।

—তা জিজ্ঞেস করবি কেন? ছেলেটা আমাদের হয়ে কত উপকার করে আর তুই দেখছি ইদানীং ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিস না, কেন রে। আমরা সেটা লক্ষ করেছি। আমি জানতে চাই কেন?

তিস্তা আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়েছে। বলল, 'আমার কি ঠেকা পড়েছে। তোমাদের দরকার তোমরা করবে। আমি ওর মধ্যে নেই। ওকে আমি তেল মাখাতে পারব না। ওকে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে এসো না। ওর মতো বাজে ছেলে আর হয় না।'

—তুই বুঝি খুব ভাল মেয়ে?

—তোমাদের সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

—তোর খুব মুখ হয়েছে দেখছি। ওই যে বলে না, অত বাড় বেড় না ঝড়ে পরে যাবে... তোর কাছে কথা শিখব নাকি?

—কখনও কখনও ছোটদের কাছেও শিখতে হয়।

—বা! বা! জ্ঞান দিবি না। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে উপদেশ-টুপোদেশ আর ভাল লাগে না। থাক সে সব কথা। ওকে কালকে আসতে বলেছিস তো?

তিস্তা চুপ করে আছে। মাসি একটু জোরেই বলল, 'আমি তোমাকে একটা কিছু বললাম।'

—ঠিক আছে।

—এখন তো লায়েক হয়ে গিয়েছ। শুনবে কেন। আমরা তো এখন সংসারের জঞ্জাল। ফেলে দিলেই হয়। আমরা আর ক'দিন আছি। যে ক'দিন আছি শান্তিতে থাকতে দে।

—আমি আবার কী অশান্তি করলাম, তুমিই তো বললে, আমি তো কিছু বলিনি।

—আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া চাই না। যে ক'দিন আছি শান্তিতে থাকতে চাই।

জয় হতভম্ব! কী বলছে তিস্তা! পাগল হয়ে গেল নাকি! আমি তো কোনওদিন ওই চোখে দেখিনি। কী করছে তিস্তা। মনে মনে ভাবছে কিন্তু তিস্তাকে সরাতে পারছে না।

—না করেছে কে। থাক না থাক। তুমি কিন্তু বাজে বাজে কথা বলছ। আমাকে রাগাবে না। অত চিন্তা করো না তো। যা হবার হচ্ছে। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। জানো আজকে কত বড় অনুষ্ঠান হল। তোমরা গেলে না, বাজারে গেলে, কেন? তোমার মেয়ে গান গাইছে, নাচছে দেখতে ইচ্ছে হল না। এই দিনটা কি আর আসবে? তোমার সংসার নিয়েই থাকো। সংসারে তো তিনটে মানুষ। অত চিন্তা কীসের। চা করো তোমার হাতের চা খেতে ইচ্ছে করছে।

সহজিয়ার আর কিছুই ভাল লাগছে না। কবীরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মনটা উরু উরু। এত সুন্দর মানুষ হয় কবীরকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেমনি লম্বা তেমনি গায়ের রং, লালচে হলুদ। এক গাদা মাথা ভর্তি চুল। কাননদেবীর মতো চোখ। টিকালো নাক। ওর দিকে তাকালে কোনও মেয়েই চোখ ফেরাতে পারবে না। সহজিয়াও পারেনি। আস্তে আস্তে কথা বলে। এক ফোঁটাও ভুঁড়ি নেই। যাকে বলে এক কথায় সুপুরুষ। ক'দিন যাবৎ কবীরের কথাই ভাবছিল। হঠাৎ করে এল, বুকের ভেতর ঢেউ তুলে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে যে পার্থ ডাক্তার এসেছিল তাকে দেখতে ভাল। উত্তর বাংলার লোকদের কি ভাল দেখতে হয়। ওখানে কি সবাই সুন্দর? কুমারটুলিকে হার মানায়। ফোন নম্বরটা কোথায় রেখেছে খুঁজে দেখতে হবে। অনেকদিন ভেবেছে ফোন করবে কিন্তু করা হচ্ছে না। ফোন তো করতেই পারে শরীর সম্পর্কে খবর নিতেই পারে। তাতে তো কোনও দোষ নেই। চিকিৎসার সময় ডাক্তারের পাশে থেকে সাহায্য করেছে। কিন্তু কেউ যদি ভাবে হ্যাংলা ভাবতেই পারে। এই নিয়ে হাসাহাসি হবে সেটা কি ঠিক হবে? সহজিয়া এসব ভাবে কারণ জয়ের সঙ্গে কিছুটা কাছাকাছি গিয়েছিল বলেই না তিস্তার সঙ্গে সম্পর্কে চির ধরল। তিস্তা এত ভাল মেয়ে সে কী করে এত বড় একটা ভুল করল। স্টেশনে গিয়ে ফিরে এল। আসলে তিস্তা জয়কে ভালবাসে, কিন্তু সেইভাবে কোনওদিন জয়ের দিকে এগোয়নি। যেই দেখেছে অন্য একটা মেয়ে এগিয়েছে তখনই টনক নড়েছে। কবীরের কাছে গিয়ে দেখবে ওর সঙ্গেও কেউ না কেউ জড়িয়ে আছে। আবার আঘাত। বার বার আঘাত তো সহ্য করা যায় না, বড় কঠিন। সেইসব ভেবে সহজিয়া ফোন করেনি বার বার চেষ্টা করেও নম্বরটা টিপতে পারেনি। মনের ভেতর থেকে কে যেন বাধা দিয়েছে, খবরদার আর নয়। জয়ের কথা মনে নেই? সাবধানে পা ফেলতে হবে। কিন্তু মন যে চায় ফোন করি, কথা বলি। ওর চোখ দু'টো কেন যেন ডাকে। ওর চোখে দুর্বার আকর্ষণ। যখনই ওর কথা ভাবে তখন বুকের মধ্যে ঢেউ ওঠে যে ঢেউ যেমন তেমন নয়। সর্বনাশা ঢেউ। সমস্ত দেহটাকে গিলে খেতে চায়। সাংঘাতিক টান চুম্বক যেন। ডাঃ পার্থ বলেছিল, দুর্গাপূজার সময় ওদের ওখানে যেতে। সহজিয়া কথা দিয়েছিল যাবে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বাধা আছে। তখন তো ডাঃ পার্থর মুখের ওপর না বলতে পারেনি। যতই দিন এগিয়ে আসছে কেমন একটা খটকা লাগছে। কিন্তু কিন্তু ভাব মনের মধ্যে থেকেই যায়। আজ বিকেলে কথা বলবে। কথা বলতে তো কোনও দোষ নেই। কিন্তু কী একটা ভয় মনের ভেতরে তোলপাড় করে। কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। কিন্তু কিন্তু মন নিয়ে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। সহজিয়া বোঝে কিন্তু কোথায় যেন একটা অস্বস্তি থেকেই যায়।

সেদিন ছিল রবিবারের বিকেল। বসন্তের দিন চারদিকে ফুরফুরে হাওয়া, মনে একটা গানের কলি ভেসে আসছিল সহজিয়ার, 'ফাগুন হাওয়ায় লাগল যে দোল, দে দোল / আজি এই বসন্ত সমীরণে লাগল যে দোল'। মোবাইলটা নিয়ে পরপর নম্বর টিপেই ফেলল। ডুয়ার্সের গাছপালার গন্ধ নিয়ে সুমধুর কণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যালো কবীর বলছি।' সহজিয়া তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দেয়। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বলার যে কিছু নেই। তবু কেন কথা বলতে ইচ্ছে করে, বার বার পিছু ডাকে? গুন গুন করে বাতাস কী বার্তা নিয়ে আসে—'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার'।

আবার মোবাইলটা বেজে উঠল। সহজিয়া কেঁপে ওঠে। এবার কী করবে, কী বলবে? কথাগুলো ভেতর থেকে এসে ঠোঁটেই আটকে যায়। মনটাকে ইচ্ছে করে গামছা দিয়ে বাঁধে কিন্তু পারা যায় না। কেন এমন হয় তার উত্তর নিজের কাছে নেই। আবার ফোনটা বেজে উঠল। সহজিয়া ফোনটা ধরল। ওদিক থেকে ভেসে এল, 'সহজিয়া আছে?'

—বলছি।

—কবীর বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিল ফোনটা। আবার বেজে উঠল।

সহজিয়া আস্তে আস্তে বলল, 'সহজিয়া বলছি।'

—আমি কবীর চিনতে পারছ? কেমন আছো?

—ভাল। আপনি?

—আছি একরকম। পুজোর সময় এখানে আসবে। তোমার জন্য বিশাল অনুষ্ঠান হচ্ছে। দু'একটা রবীন্দ্রসংগীত শিখে এসো।

—কেন? আমি গান গাইতে জানি। ছোটবেলায় দু'এক বছর শিখেছিলাম। গান শুনি, আমি গান জানি না।

—ডাক্তার তো বলেছে, তুমি গান জানো।

—মিথ্যে কথা। বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

—আমি মনে করি তুমি গাইতে পারো।

—আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন। কলকাতায় তো আসতে হবে। রিপোর্টগুলো দেখাতে হবে।

—মাঝামাঝি সময় যাব। ঠিক আছে। ফোন করো। ভাল থেকো।

—রাখি।

—আচ্ছা। বলেই কবীর ফোনটা বন্ধ করল।

সহজিয়া ফুটছে। গরম জল যেমন কড়াইতে ফোটে সেইরকম। পুজো তো অনেক দেরি। পারলে একবার এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করে সহজিয়ার। ইচ্ছে করলেই তো যাওয়া যায় না। সামান্য পরিচয়। এভাবে এক জায়গায় হঠাৎ চলে যাওয়া যায় না। সময় হলে নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। ফোন ছেড়ে নিচে নেমে এল। দেখল একটা বিয়ের কার্ড। কার বিয়ে খুলে দেখল। জয় তিস্তার বিয়ে এই মাসেই। সহজিয়ার শরীর কাঁপছে। একটা ঝড় উঠল শরীরে মনে। সেই ঝড় কী করে থামবে কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করল বানারহাটে যাওয়া নয়। যার জন্য যেতে চেয়েছিল সেই পাট শেষ। শুধু শুধু গিয়ে আরও ঝামেলার মধ্যে গিয়ে পড়া। আবার ভাবল যখন ওরা ফোন করবে তখনই বলে দেবে। এইসব ভাবছে ঠিকই কিন্তু চোখে জল এসে যাচ্ছে। বাধ মানছে না। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছে না। সহজিয়া ভাবল, আমার জীবনটাই লড়াই দিয়ে শুরু। খবর তো খারাপ হবেই। এই নিয়ে চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। ওরা সুখে থাক, ভাল থাক। ভগবানের কাছে সেই কামনাই করি। ডাঃ পার্থ, কবীর যতই বলুক না কেন চামুর্চির নাকের ডগায় কি কারও অসুবিধা করা উচিত। যা ঘটে তা ভালর জন্যই ঘটে। তিস্তা ও জয় ছোটবেলার সঙ্গী। একসঙ্গে বড় হয়েছে। পড়াশোনা, খেলাধূলা সবই করেছে। দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসত। সেটা প্রকাশ ছিল না। আমার জন্যই সেটা হয়েছে। এর চেয়ে ভাল খবর আর কিছু হতে পারে না। জয়ের জন্য মন খারাপ লাগে বটে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটতে চলেছে সেটা ভেবে ভাল লাগছে। সুতরাং হয়ত এটা তার পক্ষে ভালই হল।

তিস্তা ঘুমাচ্ছিল। ঝড়ের বেগে জয় ঘরে ঢুকল। তিস্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। দরজা খোলা ছিল সেদিকে খেয়াল ছিল না। তিস্তাকে ধরে সমানে দাপাদাপি করছিল। পাগলের মতো চুমু খাচ্ছিল। সেই সময় মাসি, ছোট মাসি বড় মাসিকে ডাকল। তখন তিস্তা জয় বাস্তবে ফিরে এল। বড়মাসি বলল, এই মাসেই তোদের বিয়ে, আর দেরি নয়। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, আমাদের বোঝা উচিত ছিল। ওদের দু'জনকে আর এভাবে ছেড়ে রাখা যাবে না। তোরা এখন আর মানুষ নেই। আর চিন্তা করতে পারব না, ভালই হল ছেলে খুঁজতে হল না। পুরোহিতকে খবর দাও। রেজা করিমকে খবর দাও। শহরের গন্যমান্য লোকদের খবর দাও। বিয়েটা বাঙালি মতেই হবে। মসজিদ থেকে ইমাম আসবে, গির্জা থেকে পাদ্রি আসবে। বুদ্ধিষ্ট মন্দির থেকে পুরোহিত। সকলের উপস্থিতিতে বিয়েটা হবে।

সহজিয়া যেন লাইটহাউসের মতো তবু কোথাও জ্বলজ্বল করছে। আর সেই আলো ধরে একটি জাহাজ নোঙর ফেলল চামুর্চিতে।

(সমাপ্ত)

অঙ্কন : সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

চল্লিশে পা দিল জলপাইগুড়ির কলাকুশলী

উনচল্লিশ পেরিয়ে চল্লিশে পা দিল জলপাইগুড়ি কলাকুশলী। একটানা চল্লিশ বছর ধরে কোনও একটি শিল্প মাধ্যম নিরন্তর চর্চা করে যাওয়া যে কোনও সংস্থার পক্ষে নিঃসন্দেহে শ্লাঘার বিষয়। বিশেষ করে জলপাইগুড়ির মতো একটি প্রান্তিক মফস্‌সলে। তবে নাট্যচর্চা মানে যদি শুধু নাট্য প্রযোজনা কিংবা অভিনয় হয় তাহলে চল্লিশ বছর টিকে থাকাটা খুব কিছু বলার বিষয় হয় না। শুরু থেকেই প্রতিবছর কলকাতার কোনও দলের অনেকবার মঞ্চস্থ হয়ে যাওয়া কিংবা বাতিল হওয়া একটা নাটক আট মাস মহড়া দিয়ে মঞ্চস্থ করা, ফের একটি নাটকের খোঁজ—এও তো এক ধরনের নাট্য চর্চা। নাট্যরীতি-আঙ্গিক-প্রয়োগ-কৌশল ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটে। অন্তত অতি সামান্য হলেও সেই সমৃদ্ধিতে অবদান থাকে নাট্যদলের। অর্থ যদি এতটাই ব্যাপক হয় বা তার চেয়েও কিছু বেশি হয় তাহলে কলাকুশলী কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে এই চল্লিশ পেরিয়েও?

গত শতকের সাতের দশকের অস্থির সময়ে যখন জলপাইগুড়ির বুকে দলটা আত্মপ্রকাশ করে, তখন একঝাঁক নবীন সম্বলিত প্রথম নাটক 'জটায়ু' রচনা ও নির্দেশনা হিমাংশু গুহ রায়। একটা পরিষ্কার স্টেটমেন্ট দেয় যে ছাপানো নয়, নিজস্ব পাণ্ডুলিপিই হবে তাদের প্রথম পছন্দ, আর সেই সঙ্গে এটাও সদর্পে ঘোষণা করে বিনোদনের চলতি স্রোতে

কলাকুশলীর পথ নাটক সমগ্র উত্তরবাংলায় সাড়া ফেলেছিল।

আবার নিজেদের প্রযোজনা বাদ দিয়ে কলকাতার বিখ্যাত নাট্যদলগুলিকে নিয়ে এসে স্টারকাস্টওয়ালা জনপ্রিয় প্রযোজনা দিয়ে নাট্য উৎসবের মাধ্যমে বিনোদন বিতরণ—এও তো নাট্যচর্চার অন্য একটি রূপ যা সাম্প্রতিককালে বেশ চালু নগরে মফস্‌সলে। এভাবেও পেরিয়ে যাওয়া যায় অনেকদিন। তাহলে কলাকুশলী আলাদা কোথায়? তবে নাটকের ক্ষেত্রে 'চর্চা' মানে যদি বলা যায় 'খোঁজ' কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন অন্বেষণ অথবা যদি বলা হয় নির্মাণ বিনির্মানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সেই বিশেষ শিল্পটিকে, তবে আক্ষরিক অর্থেই গা ভাসানো তাদের কাজ নয়, ক্রমাগত ঘা খেয়ে চলা মানুষ, তাদের জীবন সত্য, তাদের সংগ্রামেরই শরিক হবে তাদের নাটক। এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় ক্রমে যখন 'অঙ্গার', 'টিনের তলোয়ার', 'সিংহাসন', 'গ্যাবিয়াল পেরি'র মতো রাজনৈতিক নাটক একের পর এক মঞ্চস্থ হতে থাকে গত শতকের সাত ও আটের দশক ধরে। নয়-এর দশকে বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী প্রযোজনা—'সঙের পালা'। রচনা ও নির্দেশনা কুমারেশ দেব। জলপাইগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবাংলাকে আক্ষরিক অর্থেই কাঁপিয়ে দেয়। দশ বছর ধরে ৪২ বার এ নাটক পথে ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। যে কোনও মফস্‌সলের দলের কাছে এটা একটা ব্যাপার। '৯০-এর দশকে 'দুঃস্বপ্নের গভীরে', 'উৎস সন্ধানে' এবং অবশ্যই 'সেই মুখ' উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। এই সময়েই কলাকুশলীর ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেয়। দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিপ্রা দেব ও রত্না সেন রায় কচিকাঁচাদের নাটকের ক্লাস শুরু করেন, নাম দেন 'নতুন কুঁড়ি'। 'সূর্যলুট'-এর প্রথম ফসল। এই কুঁড়িরা অচিরেই ফুল হয়ে ফোঁটে এবং দলের ফুসফুসে ভরে দেয় নতুন অক্সিজেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক নতুন শতকের গোড়ার দিকেই আসে আর চলে বেশ কয়েক বছর রীতিমতো আলোচনায় থেকেই। শুধু উত্তরের নানা মঞ্চে নয়, খোদ তিলোত্তমার বুকেও তিনবার। 'যুদ্ধযুদ্ধ খেলা', যাকে সঙের পালার এক্সটেনশন-ই বলা যায় খানিকটা, আঙ্গিকে অভিনয়ে। নাচ, গা কুস্তি, নতুন ধারার অভিনয়, জুড়ির গান, আর আলোর কাজ এ নাটককে বিশিষ্ট করে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'যুদ্ধযুদ্ধ খেলা' জন্ম দিল বেশ কয়েকজন কলাকুশলীর ও পরবর্তীকালের নির্দেশকের। যিনি এ নাটক থেকেই শুরু করলেন তাঁর ম্যারাথন দৌড় যা চলছে আজও। সেই থেকে বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের নাটক সমান গুরুত্ব পেয়ে চলেছে কলাকুশলীর কাছে। ছোটদের পরপর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ 'মন পাবনের নাও', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'ঘুড়ি', 'ইঁদুর', ছোটদের নাটকের সংজ্ঞাই যেন পাল্টে দিয়েছে। এর মধ্যে ইঁদুর নাটকটি কলকাতার ব্ল্যাঙ্ক ভার্স নাট্যদলের নির্দেশক রাজা ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে একটি কর্মশালা ভিত্তিক প্রযোজনা। গুয়াহাটিতে জাতীয় শিশু নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত ও অভিনীত হয় অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে। তমোজিৎ রায়-এর নির্দেশনায় 'অশ্বত্থামা', 'নেমেসিস', 'সৃজন ছন্দে'র পাশাপাশি অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের রচনাও নির্দেশনায় অভিনীত হয় সাদ্রি ভাষার লোকনাট্য 'সর্বাশী', অর্ণব-তমোজিতের যৌথ নির্দেশনায় 'প্রসব'। এই নাটকগুলো একদিকে যেমন থিয়েটারের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক খুলে দিচ্ছিল অন্য দিকে গড়ে তুলছিল জলপাইগুড়ি থিয়েটারের নতুন দর্শক। আর একজন শিল্পী মঞ্চে, পোশাক পরিকল্পনায়

মঞ্চ মায়ার বাইরে পথে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পথ মুক্তাঙ্গন নাট্য এবং পথনাটক। এখানেও খুব একটা পিছিয়ে নেই কলাকুশলী। প্রতি বছর সফদর হাসমির জন্মদিন উপলক্ষে পালিত হয় জাতীয় পথ নাটক দিবস। নাটক অভিনীত হয় মানুষের মুখোমুখি।

ঘটিয়ে চলেছিলেন নিঃশব্দ বিপ্লব— অভিজিৎ বসু। উত্তরের মঞ্চশিল্পীদের নিয়ে কোনও সন্দর্ভ লেখা হলে অভিজিৎকে নিয়ে অবশ্যই অনেক নিউজপ্রিন্ট খরচ করতে হবে। দলের প্রবীণ রূপসজ্জা শিল্পী সরিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গে রূপসজ্জাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে চাইছেন তিনি।

বিগত দু-তিন বছর কলাকুশলীর কিছু প্রযোজনা বিষয় নির্বাচনে ও আধুনিক নাট্যভাষা নির্মাণের নিরিখে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস 'মৃত্যোর্মা অমৃতম' অবলম্বনে তমোজিতের নির্দেশনায় ২০১০-এ নির্মিত 'পোস্ট অফিস ইন পোল্যান্ড-১৯৪২' বিধৃত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ডের নাৎসি ঘেঁটোয় ডাকঘর অভিনয়ের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়দের অভিনয়, পোশাক, আবহ গভীর রেখাপাত করে দর্শক মনে। বিশেষ করে অমল / আব্রাসার চরিত্রে অরিজিৎ, সুধার চরিত্রে অর্কপ্রিয়া, রেবেকা রথচাইল্ড চরিত্রে করবী গোস্বামী ও ডঃ কোরচখের চরিত্রে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয় আলোচিত হয় আজও। ২০১২-তে এর পুনর্নির্মাণে ডঃ কোরচখের চরিত্রে অপূর্ব সাহা অভিনয় করেন বেশ কয়েকটি মঞ্চায়নে এবং অবশ্যই দর্শক মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি অধিকাংশ নাটকেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই বছরেরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা 'কেঁচো' তিন বছর ধরে অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরের অধিকাংশ জেলায়। টাইম আর স্পেস নিয়ে খেলা আর অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। অপূর্ব সাহা, তমাগ্নি শীল আর রাজীব চক্রবর্তীর পাশাপাশি সৌরভ, সৌগত, অমিতের কোরিওগ্রাফি এ নাটককে অন্যরকম স্তরে পৌঁছে দেয়।

এবার আসা যাক এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত প্রযোজনা 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১৪) প্রসঙ্গে। দেবেশ রায়ের সুদীর্ঘ এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে বাংলার ইতিহাস বিস্মৃত এক অবিসংবাদী দলিত নেতার জীবন ও সেই সঙ্গে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭—এই দশ বছরে বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া সব কাহিনির অভিঘাত। এই উপন্যাসের পাঠক মাত্রই জানেন কী দুঃসাহসিক ভাবনা একে মঞ্চায়িত করা। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কলাকুশলীর তিন প্রজন্মের মিলিত প্রচেষ্টায়। তমোজিতের দৃশ্য বিন্যাস ও আলোক পরিকল্পনা, অভিজিতের মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনা, অভ্রদীপের ভিডিওগ্রাফি, কৃষ্ণেন্দুর আবহ ও ২৬ জন কলাকুশলীর দুর্দান্ত টিমওয়ার্কে ইতিহাস জীবন্ত হয়েছে মঞ্চে। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কলাকুশলীর

কলাকুশলী চার দশক পেরিয়েও অটুট, কখনই কেউ ভেঙে বেরোয়নি।

তো বটেই জলপাইগুড়ির ইতিহাসে এটাই প্রথম 'ডকুড্রামা'। উত্তরবাংলায় এর ইতিহাস আছে কিনা জানা নেই। তবে আলোচকদের মতে ডকুমেন্টেশন আর ইমোশনের যথার্থ মিশেল হয়েছে এ নাটকে তাই এত মনোগ্রাহী হতে পেরেছে। কলাকুশলীর সাম্প্রতিকতম মঞ্চ প্রযোজনা 'ভোকাট্টা' একটি ছোটদের প্রযোজনা হিসেবেই মঞ্চায়িত হয়েছে। কিন্তু ছোট বড় মিলে এই নাটক যেভাবে সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষকে উদ্বেল করে চলেছে, তাতে একে আর শুধু ছোটদের নাটক বলা যাচ্ছে না। রাজন খোসা'র ছবি 'গাট্টু' থেকে অনুপ্রাণিত এ নাটক এক স্কুল-ছুট ছেলের স্কুলে ফেরার গল্প বলে। গল্প বলে তার স্বপ্ন উড়ানের। ঘুড়ির মতোই জীবনের খেলায় হারতে হারতে জিতে যায় লাট্টু।

মঞ্চ মায়ার বাইরে পথে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পথ মুক্তাঙ্গন নাট্য এবং পথনাটক। এখানেও খুব একটা পিছিয়ে নেই কলাকুশলী। প্রতি বছর সফদর হাসমির জন্মদিন উপলক্ষে পালিত হয় জাতীয় পথ নাটক দিবস। নাটক অভিনীত হয় মানুষের মুখোমুখি। কলাকুশলী প্রযোজিত 'খুড়োর কল', 'আবর্তন', 'ভূতপাঁচালী', 'হিপ হিপ হুররে', 'হের হোঁদল দা' প্রভৃতি নাটক রাজনীতি ও সমাজের কথা বলে কোনও রাখঢাক না রেখেই। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কাহিনি অবলম্বনে সাম্প্রতিকতম নাটক 'ফোঁড়া'।

একটা বিষয় যা প্রায়শই যে কোনও নাট্যদল সম্পর্কিত আলোচনায় বাইরে চলে যায়, তা হল সংগঠন। বাঁধন দৃঢ় না হলে ভাঙ্গন আটকানো অসম্ভব। সবাই জানে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার মানেই ভাঙ্গনের ইতিহাস। স্বার্থের সংঘাত, ঈর্ষা যে কোনও দলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়, সে যতই ছোট দল হোক না কেন। কলাকুশলী এমন এক দল যা চার দশক পেরিয়েও এখন পর্যন্ত অটুট। বিস্ময়কর এ কাজটি সম্ভব হয়েছে সংগঠকের জন্য। যারা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন সব সদস্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার। আজ তাই কলাকুশলী সকলের প্রতি ভালোবাসায়, মমত্বে, বন্ধুত্বে এবং দায়বদ্ধতায় এক দৃঢ় সংঘবদ্ধ পরিবার।

এ পর্যন্ত বড় ছোট মঞ্চ পথ মিলে মোট ৭৪টি নাটক তৈরি করেছে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী। করেছে অনেক নাট্য উৎসব, বিদ্যালয় নাট্য উৎসব, সেমিনার, কর্মশালা। শুধু নাটক করাই নয়, অভিনয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'অভিমুখে গমন', এক নির্দিষ্ট দিকে পথ চলা আর সমাজকে নিরন্তর পেনিট্রেট করা সেই অভিমুখে যাবার জন্য কলাকুশলী এখনও, এই আকালেও সেই পথে চলেছে আর চলার স্বপ্ন দেখছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ডুয়ার্সের ডিশ

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের প্রাক্কালে ডুয়ার্সের রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ এল। সকাল ন'টা নাগাদ আমগুড়ি গ্রামের নৃপেন রায়ের বাড়িতে যাওয়ার কাঁচা রাস্তায় যখন পৌঁছলাম, তখন ভেঙে পড়বে বলে আকাশ অপেক্ষা করছিল। রান্নার আয়োজন শুরু হতেই নামল তেড়ে বৃষ্টি। ঘণ্টা দুয়েক পর আকাশ আবার হালকা। এরপরেও অবশ্য খুচখাচ বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সব মিলিয়ে রান্নার ফুর্তিতে যে কোনও বাধাই পড়েনি, তা মালুম হল ভোজাসনে বসে। আহা! চারটে রাজবংশীয় পদ 'কলাই চালের ছ্যাকা', 'শুষুনি শাক দিয়ে সিং মাছ', 'সিদল' আর 'হাঁশবাশ'-এর সঙ্গে ছিল আরও কিছু। আমরা আপনাদের জানাব ওই চারটেরই কথা। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে। আর আগামী সংখ্যায় থাকছে রাজবংশী খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিস্তারিত রচনা।

সিদল অথবা স্বর্গীয় শুঁটকি

গোড়াতেই জানিয়ে রাখি সিদল খেতে হলে আপনাকে অন্তত দু-সপ্তাহ আগে থেকে মাঠে নামতে হবে। যেদিন মাঠে নামবেন, তার আগের দিন জোগার করে রাখুন—শুঁটকি মাছ আর কচুশাকের ডাটা। খুব ভাল হয় যদি শুঁটকি মাছগুলো রোদ্দুরে আরও কয়েকদিন শুকিয়ে নেওয়া যায়। সেটা সম্ভব না হলে একটু সেঁকে গরম করে নিতে পারেন। কচুশাকের ডাটা কুচি কুচি করে কেটে ফেলুন।

শাকের কুচি আর শুকনো (খটখটে রেকমেন্ডেড) শুঁটকি মাছ ভাল করে পিষে নিন। রাজবংশীরা শিলনোড়ায় পিষে নেয়। আপনি যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। পিষে নেওয়ার পর তার মধ্যে সর্ষের তেল আর হলুদ মিশিয়ে ভাল করে মাখুন। যদি মিশ্রণের পরিমাণ ২০০ গ্রাম হয়, তবে তা চারটে মণ্ড বানিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিন। কম করে দু-সপ্তাহ। যত শুকোবেন, স্বাদ তত খুলবে।

যাই হোক দু-সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা শেষ হলে জোগার করে ফেলুন দু'টো রসুন, মাঝারি আকারের চারটে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা আটটি এবং পরিমাণ মতো সর্ষের তেল আর লবণ। এটা একটা মন্ডের জন্য। সিদলের একটা মণ্ড ঝর ঝরে করে ভাজুন। তাওয়ায় সামান্য তেল দিয়ে রসুন আর লঙ্কাগুলো ভেজে নিন। এবার সব কিছু আবার বেশ করে বেটে ফেলুন। বাটা হলেই তৈরি আসল 'সিদল'। একটু সর্ষের তেল মাখিয়ে নিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে সে-ই স্বাদ।

রোদ্দুরে ভালো করে সিদল মণ্ড শুকিয়ে আপনি প্লাস্টিকে মুড়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন অনেক দিন। মাঝে মাঝে বের করে একটু রোদ্দুরে শুকিয়ে নেবেন। মনে রাখতে হবে পুরনো সিদল স্বাদে বাড়ে। ডুয়ার্সের অনেক গ্রামে সিদল মণ্ড বিক্রি হয়। সিদল মণ্ড ছোট মাছের শুঁটকি দিয়ে বানাতে হবে। একাধিক ছোট মাছের শুঁটকি দিয়ে বানানোটাই প্রথা। পয়া, টাকি, ট্যাংরা, দাড়িকা, পুঁটির ব্যবহার বেশি।

কানন রায়

ভজহরি মান্না®
স্বাদে গুণে ভরপুর আহার
Bengali Home Style Cuisine
Bhojohori Manna®
GOOD FOOD ! GREAT FUN !

SILIGURI
HOTEL GOLDEN MOMENTS
143 HILL CART ROAD SILIGURI 734001 ✆ (0353) 2535826
FREE HOME DELIVERY 9434210011

KOLKATA | SILIGURI | PURI | BENGALURU | MUMBAI
www.bhojohorimann.com

সঠিক মেকওভার ও গ্রুমিং আপনাকে অপরূপা করে তুলতে পারে

কিছু টিপস দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

সেদিন মেট্রো থেকে নামছি হঠাৎ একটা মেয়ে এসে প্রশ্ন করল— কি চিনতে পারছো? সত্যি বলতে আমি চিনতে পারিনি। মেয়েটা সুশ্রীও যথেষ্ট গ্ল্যামার আছে, পোশাকের প্রতি রুচিবান। ও যখন আমাকে জড়িয়ে বললে আমি রুমেলা, আমি তো হতবাক! সেই মোটা আনস্মার্ট, গ্ল্যামারবিহীন মেয়েটা? আমি যাকে সবসময় নানারকম টিপস দিতাম! ওর মাকেও সচেতন করতাম, সত্যি বলতে কি ভগবান সবাইকে সমান ভাবে পৃথিবীতে পাঠান না— কিন্তু সঠিক পরিচর্যা সবাইকে অপরূপা করে তুলতে পারে।

বর্তমান যুগে মেকওভার বলে একটা শব্দ ম্যাজিকাল কাজ করে চলেছে। বিশেষজ্ঞ এই কাজটার প্রতি যত্নবান। কোন চেহারায় কী ধরনের হেয়ারস্টাইল করলে, কী ভাবে আই ভ্রাউ করলে আপনার চেহারায় আসবে পরিবর্তন সেটা বিশেষজ্ঞ ঠিক করে দেবেন। ত্বকের পরিচর্যা ঠিক মতন করতে হবে। এর ফলে গ্ল্যামার এসে যাবে। অনেকে কমপ্লেক্সান নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করেন। গায়ের রং বদলানো যায় না— তবে ঠিক পরিচর্যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বারে। তাতে আপনার কনফিডেন্স বারে এবং গ্ল্যামারও বারে। পোশাকের দিকে নজর দিতে হবে। কোন রং আপনার ত্বকে আরও উজ্জ্বল দেখাবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কখন কোথায় কী পোশাক পরবেন এবং কী রঙের সেটা আপনাক জেনে নিতে হবে। পোশাক ও রং দুটোই মেকওভারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক আপনার পারসোনালিটির উপর প্রভাব ফেলে।

হাঁটাচলা, কথা বলার প্রতি নজর রাখতে হবে। হিল জুতো পরে কী ভাবে হাঁটবেন, ছোট জামা পরে ও ছোট স্কার্ট পরে কী ভাবে বসবেন তার দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

বর্তমানে রাস্তার কোনও কুশ্রী মেয়ে দেখা যায় না, কারণ সকলেই অল্পবিস্তর যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেক সময় ভুল পথের পথিক হয়ে থাকেন অজ্ঞতার কারণে। চেষ্টা করলে সকলেই নিজেকে গ্ল্যামারাস করতে পারেন।

অনেকে এই ভাবনার ব্যতিক্রম পথে চলেন, তারা ভাবেন সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট, এর ফলে পরবর্তী জীবনে হতাশায় ভোগেন। বয়সের আগেই বুড়িয়ে যান কর্মরতা কিছু মহিলারা বলেন ঠিক মতো সময় করতে পারি না, তাই কিছুই করা হয় না। কথায় আছে 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'।

আপনি যদি ওভার ওয়েট হন তবে জিমে থাকা, যোগাসন করুন। তৈলাক্ত খাবার বর্জন করুন। রেগুলার শরীর চর্চা করুন। এতে ফিগার ঠিক থাকবে। মেকআপ করার সময় আপনার কমপ্লেক্সানের দিকে নজর দেবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেকআপ আপনার গ্ল্যামারকে ক্ষুণ্ণ করবে, মনে রাখবেন।

স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী কথা বলুন। কথা বলার সময়েও ভাবনা চিন্তা করা উচিৎ। কথার মাধ্যমে আপনাকে বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এর ফলেও আপনি গ্ল্যামারাস হতে পারেন। স্নিগ্ধ সুগন্ধি ব্যবহার করুন, ছোট ছোট সব দিকে নজর রাখুন এবং নিজেকে করে তুলুন তিলোত্তমা । মেক ওভার আপনার সুন্দর জীবনের চাবিকাঠি।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেল আইডি-তে।

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic

Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional

7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001 Satyajit Sarani, Shivmandir

Call : 9434176725, 9434034333

ডুয়ার্সের ইতিহাসের সাক্ষী ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব চায় সরকারি সহযোগিতা

সময়টা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক। ব্রিটিশরা এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। সেদিনটি ছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের এক বিকেল। ডামডিস ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে সেদিন তিল ধারণের জায়গা নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সারি সারি মানুষের মাথা। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই ডামডিম, কুমলাই, গুডহোপ, বেতগুড়ি, সাইলি, রানিচেরা, নিউগ্লেংকো, রুপালি, রাঙ্গামাটির মতো আশেপাশের চা-বাগান তো বটেই এমনকি সোনগাছি, মানাবাড়ি, তুড়িবাড়ি, ওয়াশাবাড়ির মতো দূর দূরান্তের চা-বাগান থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চেপে মাঠে পৌঁছে গিয়েছে। দর্শকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো। উপলক্ষ্য ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ। যার পোশাকী নাম ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব বনাম প্ল্যানটার্স। সাধারণ দর্শকবৃন্দের কাছে ফুটবল ম্যাচটি সাহেব বনাম ভারতীয়দের ফুটবল ম্যাচ নামেই পরিচিত। স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলেও ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে সত্তর দশকের শেষভাগেও তাঁদের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গিয়েছে। সেই সাহেবদের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সমগ্র পশ্চিম ডুয়ার্স জুড়ে স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে সে কি উন্মাদনা! একদিকে চা-বাগানের লালমুখো সাহেব ম্যানেজাররা অন্যদিকে বিভিন্ন চা-বাগানের বাছাই করা ফুটবলার। তাদের মধ্যে আবার সিংহভাগই বাঙালি। কারণ তখন ‘সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল’ কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলেই মান্যতা পেত। বাঙালি ছাড়াও চা-বাগানের আদিবাসী ও নেপালি শ্রমিকদের মধ্যে যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল তাদেরও সুযোগ দেওয়া হত। সেই সময়ের ভাল ফুটবলাররাও এই প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত। খেলা শুরু হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা! ভারতীয় খেলোয়াড়দের পায়ে বল পড়লেই দর্শকদের চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে! বলাই বাহুল্য কয়েক হাজার দর্শকের সমর্থনপুষ্ট এগারোজন দক্ষ ভারতীয় খেলোয়ারের সঙ্গে ফুটবল অপটু চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারদের অসম লড়াইয়ে প্ল্যানটার্সকে গোলের মালা পড়ানো হত। আর তাই দেখে বাঙালি, আদিবাসী, নেপালি নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সে কী আনন্দ! সে কী উচ্ছ্বাস! যেন নতুন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের জয় হল! তবে সবাই যে ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব অর্থাৎ ভারতীয়দের সমর্থক ছিল তা নয়, সাহেবদের সঙ্গে মাঠে আসা বিদেশিনী মেমসাহেবরা করতালি দিয়ে সাহেবদের উৎসাহিত করত। যদিও দিনের শেষে ফলাফলটা কখনও হত ৬-০ কখনও ১০-০। প্রতিবার হারলেও সাহেবরা কিন্তু কোনওদিনও খেলতে পিছপা হয়নি এবং মজার ব্যাপার এই ম্যাচের সিংহভাগ খরচ কিন্তু বহন করত চা-বাগান মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন বা ডিবিআইটিএ। প্রতিটি চা-বাগান থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ডিবিআইটিএ ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের হাতে তুলে দিত। ১৯৫৫ সালে ডিবিআইটিএ-এর ক্লাবকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় ওই চাঁদার পরিমাণ ছিল চা-বাগান পিছু ১০ টাকা। অবশ্য সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে চাঁদার পরিমাণ বেড়ে হয় ৫০ টাকা। যতদিন ডুয়ার্সের পশ্চিমাঞ্চলে ইউরোপিয়ান সাহেব ম্যানেজাররা বহাল ছিলেন অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষ পর্যন্ত প্রতি বছর ১৫ আগস্টের বিকেলে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল স্বাধীনতা দিবসে এতদঞ্চলের মুখ্য আকর্ষণ। আসলে পরাধীন ভারতের যন্ত্রণা যারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তাদের কাছে ফুটবল হোক বা অন্য কোনও খেলা, ব্রিটিশদের হারানো মানেই পরাধীনতার জ্বালা জুড়ানোর আনন্দ।

ডুয়ার্সের এক ছোট্ট জনপদ ডামডিমকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন চা-বাগানের বাঙালি কর্মচারী যারা বাবু নামেই বিশেষভাবে পরিচিত যেমন বাগানবাবু, মালবাবু ইত্যাদি, মূলত তাঁদের এবং ডামডিমের কিছু স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের জন্ম। প্রায় নব্বই বছর বয়সি দুই প্রবীণ সদস্য—প্রাক্তন শিক্ষক অমলেন্দু বিশ্বাস ও স্থানীয় ব্যবসায়ী ননীগোপাল দাস, যারা একসময় এই ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় অভয় সান্যাল, ললিতমোহন দাসের মতো চা-বাগানের কর্মচারী এবং যোগেন্দ্র মিত্রের মতো স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ডামডিম পোস্ট অফিসের পিছনে ১৯২৫ সালে প্রথম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু’বছরের মধ্যেই ডামডিম রেল স্টেশনের পাশে রানিচেরা চা-বাগানের অব্যবহৃত ফাঁকা জমিতে অর্থাৎ বর্তমান ঠিকানায় নতুন ক্লাবঘর তৈরি করে সেখানেই ক্লাব স্থানান্তরিত হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই খেলাধূলা বিশেষত ফুটবল ছিল এই ক্লাবের প্রাণ। পাশাপাশি অন্যান্য খেলা ও সংস্কৃতি চর্চাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর খানেকের মধ্যে মিঃ শিপসি নামে পরিচিত স্থানীয় এক চা-বাগানের মেডিক্যাল অফিসারের অর্থানুকূল্যে শুরু হয় ডিএফইউসি পরিচালিত প্রথম ফুটবল টুর্নামেন্ট শিপসি চ্যালেঞ্জার্স কাপ। ফুটবল এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের একত্রে পথ চলার সেই শুরু। তারপর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে নব্বইটা বছর। মাঝে চেল নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। কালের নিয়মেই এসেছে পরিবর্তন। বদলেছে ডুয়ার্সের আবহাওয়া থেকে জীবনযাত্রা। পশ্চিম ডুয়ার্সের প্রধান শহর রূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে মালবাজার। গুরুত্ব বেড়েছে ওদলাবাড়িরও। পাল্লা দিয়ে গুরুত্ব হারিয়েছে ডামডিম। কিন্তু বদলায়নি ডামডিমের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সঙ্গে ফুটবলের সম্পর্ক। একথা সত্যি প্রতিযোগিতার নামের পরিবর্তন হয়েছে। শিপসি চ্যালেঞ্জ কাপের পর কখনও গজেন্দ্র মেমোরিয়াল, কখনও সুষমা গুহ নিয়োগী মেমোরিয়াল কখনও পিনাকপাণী ঘোষ চৌধুরি মেমোরিয়াল কিংবা বর্তমানের ভি. বি. ডার্নাল মেমোরিয়াল উইডোয়ার্স ট্রফি। তবে নাম যাই হোক ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব পরিচালিত ফুটবল টুর্নামেন্ট আজও চলছে। যদিও এই দীর্ঘ সময়ে আশি এবং নব্বইয়ের দশকে বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন কারণে ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। সেই পঞ্চাশের দশকেও এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে

জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন চা-বাগান ছাড়াও সুদূর মালদা থেকেও ফুটবল টিম আসত। তখনকার বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে বা বি.ডি.আর-এর হয়ে অনেক নামি-দামি ফুটবলারও সেই সময় এই মাঠে খেলে গিয়েছেন। এছাড়া এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ও অসমের অসংখ্য নামজাদা ফুটবলারের পায়ের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছে ডুয়ার্সের ফুটবলপ্রেমী মানুষ। তবে শুধু ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনই নয়, সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই ডুয়ার্স তথা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বহু আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ডি.এফ.ইউ.সি। বহু টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব হয়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ি জেলার ফুটবল মানচিত্রে এক সমীহ জাগানো নাম। আশির দশক পর্যন্ত প্রচুর বাঙালি ফুটবলার ডুয়ার্সে দাপিয়ে ফুটবল খেলে গিয়েছেন। বাঙালির পাশাপাশি অসংখ্য আদিবাসী এবং নেপালি ফুটবলার ডি.এফ.ইউ.সি-তে খেলে নাম করেছে। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অনেকেই জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ির লিগে বড় দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পেয়েছে এমন উদাহরণও কম নয়। মণীশ রায়, তিলকা ওঁরাও, বিশু ছেত্রী, বলিরাম ভগত তাদের মধ্যে অন্যতম। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএফএ'র সঙ্গেও ক্লাবের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ফুটবল আইনের ব্যাখ্যা চেয়ে আইএফএ'তে ক্লাবের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে এমন নজিরও আছে।

ক্লাবের সবচেয়ে বয়োঃজেষ্ঠ দুই সদস্য অমলেন্দু বিশ্বাস ও ননী গোপাল দাসের সঙ্গে কথা বলে এবং ক্লাবের পুরনো নথি ঘেঁটে জানা গেল আশির দশক পর্যন্ত ফুটবলের পাশাপাশি ক্লাবে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন, ব্রিজ এবং ক্যারম প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হত। বাইরে থেকে প্রতিযোগীরা আসতেন অংশ নিতে। এছাড়াও ক্লাবের নিজস্ব টেবিল টেনিস বোর্ড ছিল। বসত দাবার আসরও। তবে নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে এসে ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিযোগিতাই বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু হলেও অন্যান্য প্রতিযোগিতা আর নিয়মিত করা যায়নি।

খেলাধূলার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা এবং সমাজসেবাতেও ডুয়ার্সের অগ্রগণ্য ক্লাব ছিল ডি.এফ.ইউ.সি। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব লাইব্রেরির পত্তন হয়। ওই সময় লাইব্রেরির পাঠক সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। পশ্চিম ডুয়ার্সের সংস্কৃতি চর্চাতেও ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের নাম ছিল সবার উপরে। ক্লাবের নিজস্ব বিশাল অডিটোরিয়াম এবং বাঁধা মঞ্চ ছিল। ছিল নিজস্ব জেনারেটর। সিনেমার প্রোজেক্টার মেশিন চালানোর জন্য ছিল উঁচু প্রোজেক্টার রুম। সমাজসেবাতেও ডি.এফ.ইউ.সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেটা পঞ্চাশের দশকই হোক কিংবা নব্বইয়ের দশক—মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা থেকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের বন্যায় ট্রাকে করে ত্রাণ পাঠানো কিংবা বিহারের কোশী নদীর ভয়াবহ বন্যায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে বস্তা বস্তা ত্রাণ পাঠানোর ছবি এখনও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে আঁকা রয়েছে। ডামডিম

ক্লাবের দুই বর্ষীয়ান সদস্য অমলেন্দু বিশ্বাস ও ননীগোপাল দাস।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের দীর্ঘ নব্বই বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাবকে অসংখ্যবার নানাবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনও রাজনৈতিক কারণে, কখনও কখনও বাঙালির চিরাচরিত দলাদলির কারণে। এমনকি নিরাপত্তার কারণেও এই শতাব্দীর গোড়ায় বেশ কয়েক বছরের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়।

তবে ক্লাবের ইতিহাসে সব চাইতে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিল ১৯৬১ সালের মে মাসে। সেই সময় ক্লাবের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন গুডহোপ চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিনয় সেন। ক্লাব অন্ত প্রাণ এই মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লাব তখন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। সেদিনটা ছিল শুক্রবার। আগের দিনই ক্লাব অডিটোরিয়ামের মঞ্চে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠান মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে। তখনও সাজানো মঞ্চ থেকে বাঁশ কাপড় খোলা হয়নি। হঠাৎ বিকেলবেলা সেই মঞ্চে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা অডিটোরিয়াম-সহ সম্পূর্ণ ক্লাব ঘরটিকে ভস্মীভূত করে দেয়। আশপাশের বাসিন্দারা খুব সামান্য সংখ্যক জিনিসই আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়। এই সময় হাল ধরেন ডামডিম চা-বাগানের কর্মচারী জিতেন্দ্র নাথ বোস। পুরনো টিন কাঠ জোগাড় করে নতুন ক্লাবঘর নির্মাণ করা হয়। আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় ডি.এফ.ইউ.সি।

আসলে বার বার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ানোই এই ক্লাবের চরিত্র। বহুবার নানা কারণে ক্লাব বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে। আবার সেই সংকট থেকে বেরিয়েও এসেছে। কখনও কল্যাণ ঘোষ, কখনও তাপস রায়, কখনও অরুণ মজুমদার কিংবা মানব বড়ুয়া ও দীপক দে—একেকটা সংকট এসেছে আর এদের মধ্যে কেউ না কেউ দায়িত্ব নিয়ে আবার ক্লাবকে সচল করেছে। আজ তাদেরই উত্তরসূরি ডি.এফ.ইউ.সি'র বর্তমান সম্পাদক কুমলাই চা-বাগানের কর্মচারী রঞ্জন চন্দ আশায় বুক বেঁধে মনে স্বপ্ন নিয়ে নেমে পড়েছেন ক্লাবকে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে। এই কাজে কিছুটা সফলতাও এসেছে। বেশ ক'বছর বন্ধ থাকার পর গত তিনবছর ধরে আবার চালু হয়েছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। পাশাপাশি ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা আসছে অংশ নিতে। পুরনো ক্লাবঘর ভেঙে যাওয়ায় বেশ ক'বছর আগে যে নতুন ক্লাব গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল তাও শেষ হয়েছে। এবছর নতুন ক্লাব ঘরের পাশে নতুন আরেকটি ঘর নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। প্রবীণ থেকে নবীন সকলেই আবার আগের মতো ক্লাবমুখো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ বাকি। লাইব্রেরির প্রায় শ'তিনেক বই বাক্স বন্দি হয়ে পড়ে আছে। যার মধ্যে অধিকাংশই পুরনো বই। কিছু বই আবার বর্তমানে দুষ্প্রাপ্যও। এগুলো রক্ষা করতে নতুন করে লাইব্রেরি চালু করতে হবে। এছাড়া ফুটবল ও টেবিল টেনিস কোচিং ক্যাম্প চালু করতে চায় ক্লাব। কিন্তু এই সমস্ত কাজে প্রধান অন্তরায় অর্থ। আর এখানেই ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের প্রয়োজন সরকারি সাহায্যের। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বহু ক্লাব রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর কি এগিয়ে আসবে না নব্বই বছর ধরে ডুয়ার্সের বহু পরিবর্তনের সাক্ষী ঐতিহ্যশালী ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে?

সুধাংশু বিশ্বাস

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-5, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

Show Room : **Lindsay Street, Hatibagan, Behala, Serampore (Hoogly), Chinsura (Hoogly), Bardhaman (2 B.C. Road, Near Karjon Gate), Durgapur (Benachiti, Kizer More), Barakar (Dishergarh Road), Coochbehar, Alipurduar,** Bansdroni, Kudghat, Garia, Budge Budge, Ghatakpukur, Thakurnagar (24 Pgs N.), Saharar Hat Falta, Kakdwip, Canning, Haldia (Manjushree), Jhargram, Andul (Howrah), Bali-Badamtala (Howrah), Konnagar, Rishra, Kamarkundu, Arambag, Nagerbazar, Sodepur, Madhyamgram, Basirhat (Astana Road), Krishnanagar, Aurangabad, Baharampur (Khagra), Raghunathganj, Malda (Rabindra Avenue), Kaliachak (Malda), Buniadpur (South Dinajpur), Gangarampur, Balurghat, Raiganj, Islampur, Siliguri (Bidhan Market), Dhupguri, Falakata, Maynaguri, Dinhata, Mathabhanga, Haldibari, Dhubri **and in other states**. **Contact for New Show Room : 98314 51316 / 98313 34567**

Available in other Company approved Towns : **North 24 Pgs.** - Janata Shoe (Baduria), Raja Padukalaya (Shyamnagar), Minati Shoe (Bangaon), **South 24 Pgs.** - Calcutta Shoe House (Gosaba), Pather Sathi (Siddeshwar), Laltu Shoe (Kulgachhia), **East Midnapur** - Maity Shoe (Mathchandipur), **West Midnapur** - Kaushik Traders (Ghatal), Fashion Shoe (Gorbeta), **Murshidabad** - Riju Shoe (Domkal), **Durgapur** Bidhannagar - New Nibedita Shoe Stores, **Bankura** - Padukalaya, Jyotsnalok (Bishnupur), **Purulia** - Rajesh Shoe.

Contact for Dealership : 033-2215 6356 (11 A.M. to 6 P.M.)

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.